আসমানীর কবি ভাই

জসীম উদ্‌দীন

Scanned by roni060007

Scanned by roni060007

সূচীপত্র

১। কবি ভাই'র চিঠি ২
২। আসমানী ৩
৩। গাজীর গান ৭
৪। আসমানীদের বাড়ি ৮
৫। আদিল মাতব্বরের বাড়ি ১০
৬। পীর সাহেবের বাড়ি ১২
৭। পীর সাহেবের ছেলেমেয়ে ১৫
৮। বুড়ী মা ১৮
৯। আমার কবি ভাই ২০
১০। কবি ভাইর আস্তানা ২২
১১। আসমানীকে সাপে কাটিয়াছে ২৪
১২। সাপে কাটা রোগীর চিকিৎসা ২৯
১৩। আমাদের সমাজ ৩৬
১৪। বেদের নৌকায় ৩৭
১৫। সাপ খেলান ৩৯
১৬। কেন বেদেরা অস্পৃশ্য থাকিবে? ৪২
১৭। মাল বৈদ্য ৪৩
১৮। বেদে কনফারেন্স ৪৭
১৯। পীর সাহেবের মেয়ে পানিতে ডুবিল ৫১
২০। আমার আস্তানায় পীর সাহেব ৫৬
২১। তাঁতী পাড়া ৫৭
২২। গয়মানীর হাত কাটিল ৬০
২৩। জামদানী শাড়ী ৬৫
২৪। গয়মানীর বিবাহ ৭৩
২৫। বৃক্ষ রোপন ৭৮
২৬। গয়মানীর শেষ কাহিনী ৮৫
২৭। কবি ভাই'র শেষ পত্র ৯২

Scanned by roni060007

১ কবি ভাই'র চিঠি

আমার ছোট ছোট খোকাখুকু ভাই-বোনেরা! তোমাদের কাছে আমি চিঠি লিখি। কত নাম না-জানা দেশে, কত নাম না-জানা গ্রামে তোমরা ছড়াইয়া আছ। চেনা অচেনার পার হইতে তোমাদের আমি বুক ভরা আদর জানাই।

তোমাদের কাছে এই আমার প্রথম চিঠি। এই প্রথম চিঠির পাতাগুলি আমি কোন্ আদরে ভরিয়া তুলি। বেগুন ফুলের উপর নাচে টুন-টুনি পাখি। পাইতাম যদি তাদের টুন্ টুন্ টুন্ কথা, তবে আমার চিঠির পাতাগুলি টুন-টুন করিয়া বাজিয়া উঠিত। কিসের উপর লিখিব আমার চিঠি। হলদে পাখি গাছের ডালে হলুদ গান গাহিয়া যায়, তারই ডানায় লিখিতে পারিতাম কথা! কিন্তু হলুদ কথা আমি কোথায় পাইব?

টিয়ে পাখির পাখার লালে সবুজে লেখা রঙিন চিঠি। কে লিখিয়া যেন উড়াইয়া দিয়াছে আসমানে। তেমনি রঙ যদি পাইতাম তবে লিখিতাম মনের মতন করিয়া কথা। আষাঢ় মাসের নতুন ঘন-কালো মেঘ তার উপর রামধনু রঙের চিঠি। সাতটা রঙের সাতটা আঁখরে কে যেন লিখিয়া দিয়াছে কাহার জন্য, সাতটা রঙের সাতটা রঙিন কথা! কত কাল ধরিয়া পড়িলাম। পড়িয়া পড়িয়া আবার পড়িলাম। পড়া ফুরাইল না।

মন রঙিন হইল! রঙের সূতা লইয়া লিখিলাম সেই রঙ রামধনু-শাড়ীতে। তবু পড়া ফুরাইল না, সেই সাতটা আঁখরের সাতটি রঙিন কথা!

আসমানে তো সব দিন মেঘ থাকে না। বছরে কবারই বা সেই রামধনু রঙ চিঠি দেখা যায়। কিন্তু তবু ভুলিতে পারি না সেই রঙিন চিঠি তুলিতে করিয়া কাগজের গায়ে আঁকিয়া রাখিতে চাই। কথায় গাঁথিয়া তাকে ছড়ায় ছড়ায় ছড়াইয়া দিতে চাই; তবু আঁশ মেটে না। তারই এতটুকু কথা পাখায় লিখিয়া ময়ূর ময়ূরী নাচে। প্রথম মেঘের গুরু-গুরু শব্দ শুনিয়া যারা আসমানের দিকে পাখা তুলিয়া দেখায়, গুমরে যেন বলিতে চাহে, তোমার রামধনুকে আমরা পাখায় আঁকিয়া রাখিয়াছি।

এমনি রঙিন কথা যদি জানিতাম, তবে সাতটি রঙের সাতটি কথা মাত্র লিখিতাম। আমার সোনা মনি খোকা-খুকুদের কাছে লিখিতাম। তাহারা পড়িত। চিঠির সাতটা রঙের মত রঙিন হইয়া উঠিত।

তবু কি সে চিঠি তাদের মনের মত হইত? মায়ের কোলজোড়া সোনামনি খোকা-খুকুরা। কত আদর-মাখান, চাঁদের জোছনা-জড়ান, শত শত মায়ের

শত শত বোনের রাঙা মুখের রাঙা চুমো জড়ান, ছোট ছোট হাসিখুশি মুখগুলি। আমি স্বপ্নে যেন দেখিতে পাইতেছি। তাদের মনের মত চিঠির কথা আমি কোথায় পাইব?

তবু আমি চিঠি লিখি, তোমাদের কাছে। ঘরে ঘরে সোনার খোকা-খুকুর চাঁদের হাসি। সোনার চাঁদের হাট।

সেই হাটে বিকি কিনি করিতে আসে কথার সওদাগরেরা। ছড়া কাটিয়া ছড়ার কথা ছড়াইয়া পড়ে। রূপের নদীতে রূপ-কথা সাঁতার কাটে। আমি সেই কথার বেপারী।

আমার খোকা-খুকুর হাটে সেই কথা লইয়া সওদা করিব। কিন্তু সকলের আগে কোন্ কথা তোমরা শুনিতে চাও, তোমরা আমাকে চিঠি লিখিয়া জানাইও।

২ ■ আসমানী

আজকের চিঠিতে আমি কার কথা তোমাদের শুনাইব ? কত রাজপুত্র, রাজকন্যা, কত সওদাগর, সাত সমুদ্য-তের নদী, শংকিনীর ঘাট, নেতা ধোপানীর পাট সবাই আসিয়া মনের দরজায় জড় হইয়াছে। কার কথা তোমাদের বলি। এত রাজপুত্র, রাজকন্যা, সব কিছু ছাড়াইয়া আসমানীর কথাটিই আজ কেবল মনে পড়িতেছে। মনের একটি কোণে মলিনমুখী সেই মেয়েটি, বড় করুণ চোখে আমার দিকে চাহিয়া আছে। তার কথা কি তোমরা শুনিবে?

সবাই রাজপুত্র রাজকন্যার কথা শুনিতে চায়। রাক্ষস খোক্কসের কথা বলিলে আরও ভাল। তোমাদের অভিভাবকেরা বলেন, বড় বড় বীরের কথা শুনাও। পীর। আওলিয়া-দরবেশের কথা বল। বড় বড় বীরের কেচ্ছা শুনিলে তোমরা বীর হইবে। পীর-আওলিয়ার কথা শুনিলে তোমরা পীর-আওলিয়া হইবে। তোমাদের সুনামে- দেশে-বিদেশে ডঙ্কা বাজিবে। কিন্তু আসমানীর কথা শুনিলে তোমাদের কি কোন কাজে আসিবে ?

গরীবের মেয়ে আসমানী। পেট ভরিয়া খাইতেও পায় না। তার কথা শুনিয়া তোমাদের কোন লাভ হইবে না। তবুও থাকিয়া থাকিয়া আজ শুধু আসমানীর কথাই মনে পড়িতেছে। তার সেই করুণ মুখখানি কিছুতেই ভুলিতে পারিতেছি না।

কেমন করিয়া আসমানীর সঙ্গে প্রথম আলাপ হইল সেই কথাই আজ বলিতেছি।

ঘর নাই, বাড়ি নাই, আপনার বলিতেও আমার কেউ নাই। একা একা গ্রামে ঘুরিয়া বেড়াই। আজ এ-গ্রামে কাল সে-গ্রামে। তেমনি ঘুরিতে ঘুরিতে সেদিন বড়ই হয়রান হইয়া পড়িয়াছি। দিনের বেলা ডুবু-ডুবু। একটা এঁদো পুকুরের পাড়ে আসমানীর সঙ্গে দেখা হইল। আসমানী সেই পুকুর হইতে কলসীতে করিয়া পানি লইতে আসিয়াছে।

আমি তার কাছে যাইয়া বলিলাম, “খুকু” আমি তোমার সঙ্গে একটু কথা কই?” মাটির কলসীটি কাঁখ হইতে একটু বাঁকাইয়া আসমানী জিজ্ঞাসা করিল “তুমি কে?”

উত্তর করিলাম, “আমি তোমার কবি-ভাই”।

আসমানী বলিল, “তুমি যদি কবি ভাই, তবে এত দিন তোমাকে দেখি নাই কেন? আমার মাও তো তোমার কথা কোনদিন আমাকে বলে নাই ?”

আমি বলিলাম, “তোমাদের কথা আমি ভুলিয়া গিয়াছিলাম। শহরে যাইয়া অনেক টাকা পয়সা পাইয়া মাথা ঘুরিয়া গিয়াছিল। তাই তোমাদের কথা মনে ছিল না।”

“তবে আজ আসিলে কেন ? জান ? আমাদের কত কষ্ট!”

আসমানী আরও কি বলিতে যাইতেছিল। অভিমানে তার চোখ দু’টি হইতে টসটস করিয়া পানি পড়িতে লাগিল। সে আর কথা বলিতে পারিল না।

আসমানীর উস্কোখুস্কো চুলগুলিতে হাত বুলাইয়া আমি বলিলাম, “আসমানী! তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে। তুমি একটু এইখানে বস।”

আসমানী বলিল, “কবি ভাই! তুমি একটু দাঁড়াও। আমি আগে কলসীতে পানি ভরিয়া আনি। তারপর তোমার সব কথা শুনিব।”

আসমানী পুকুরের দিকে চলিল। কত কালের এঁদো পুকুর। কচুরী পানায় ভরা। পুকুরের পচা পানিতে ব্যাঙের ছানা আর মশা কিলবিল করিতেছে। সেই পানি কলসীতে ভরিয়া পুকুর হইতে দুইটি পদ্মপাতা ছিঁড়িয়া আনিয়া আসমানী আমার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। তারপর কাঁখের কলসীটি মাটিতে নামাইয়া একটা পদ্মপাতা আমাকে বিছাইয়া দিল। আর একটিতে সে নিজে বসিয়া আমাকে বলিল, “কবি ভাই তুমি আমাকে কি বলিতে চাহিয়াছিলে এইবার বল!”

শেষ বেলার ম্লান আলোটুকু আসমানীর করুণ মুখখানির উপর পড়িয়া তাহাকে আরও করুণ দেখাইতেছিল।

আমি বলিলাম, "আসমানী! তুমি যে, এই পচা পুকুরের পানি লইয়া বাড়ি যাইবে, এই পানিতে যে নানা রোগের জীবাণু ভরা।"

তাচ্ছিল্যের সুরে ঘাড় নাড়িয়া আসমানী বলিল, "তা কেন হইবে ? এই পুকুরের পানিই তো আমরা রোজ খাই।"

আমি বলিলাম, "এই পুকুরের পানি পচিয়া গিয়াছে। ইহাতে নানা রোগের জীবাণু মেশানো আছে।"

আসমানী উত্তর করিল, "রোগ তো আপনিই হয়। রোগের জীবাণু আছে বলিয়া তো কোনদিন শুনি নাই।"

আমি বলিলাম, "তুমি হয়ত শুন নাই। কিন্তু রোগের জীবাণু আছে। আপনা হইতেই রোগ হয় না।"

"আমাশা, কলেরা, সান্নিপাতিক জ্বর, আরও বহু রোগের ছোট ছোট বীজাণু আছে। জীবাণুগুলো এত ছোট যে আমরা চোখে দেখিতে পাই না।'

আসমানী জিজ্ঞাসা করিল, "তবে তুমি কেমন করিয়া জানিবে তাদের কথা?"

আমি বলিলাম, "অণুবীক্ষণ নামক এক প্রকারের যন্ত্র আছে। সেই যন্ত্রের ভিতর দিয়া দেখিলে খুব ছোট জিনিষকেও বড় বলিয়া মনে হয়। আমাশা, কলেরা প্রভৃতি রোগের জীবাণুগুলি এই যন্ত্রের সাহায্যে দেখা যায়।"

আসমানী আমার কাছে হার মানিতে চাহে না। সে ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "আচ্ছা কবিভাই! তাহা যেন সত্য হইল। কিন্তু সেই সব রোগের জীবাণু পুকুরের পানিতে আসিবে কেমন করিয়া ?"

আমি উত্তর করিলাম, "আমাশা বা কলেরা রোগীর পায়খানা প্রস্রাব ভরা কাপড়-চোপড় লোকে পুকুরের পানিতে আনিয়া ধোয়।

তাহাতেই পুকুরের পানিতে এই সব রোগের পোকা জন্মে। এই পুকুরের পানি যাহারা পান করে তাদের এই সব রোগ হওয়ার খুব ভয় আছে।"

আসমানী বলিল, "কবি ভাই, এবার তোমার কথা সত্য বলিয়াই মনে হইতেছে। আজ দুই মাস আমাশা হইয়া আমার বাপ মরিয়াছে। তবে আমিই তো এই পুকুরের পানি খাওয়াইয়া আমার বাপকে মারিয়া ফেলিয়াছি।" আসমানীর সুন্দর মুখখানি কাঁদো কাঁদো হইল।

আমি বলিলাম, "আসমানী! কাঁদিও না। তুমি তো জানিতে না, এই পুকুরের পানিতে আমাশার জীবাণু মেশানো আছে। আজ হইতে সাবধান হও। এই পচা পুকুরের পানি আর খাইও না।"

আসমানী বলিল, "কবি ভাই, তুমি তো বলিলে, এই পুকুরের পানি খাইও না, কিন্তু আমাদের এই তল্লাটে আর একটি মাত্রও পুকুর নাই। আমরা পানি পাইব কোথায়?"

আমি বলিলাম, "এই পানি তোমরা খাইও, তবে গরম করিয়া ফুটাইয়া খাইও। পানি গরম হইয়া যখন টগ্‌বগ্‌ করে তখন সেই পানিতে কোন রোগের পোকা থাকে না। গরম পাইয়া তাহারা মরিয়া যায়।"

আসমানী বলিল, "বড় ভাল কথা শুনাইলে কবি ভাই। আজ হইতে আমরা পানি ফুটাইয়া খাইব। রাত হইয়া আসিল, আমি এখন যাই! আদাব!" আমার কাছ হইতে বিদায় লইয়া আসমানী চলিয়া গেল।

সেই নির্জন পুকুরের ধারে একা বসিয়া রহিলাম। চারিধারে গভীর জঙ্গল। তাহাতে আঁধার করিয়া আসিতেছে। বাদুর পাখিরা সেই আঁধার যেন পাখার উপরে লইয়া উপরের আসমানে লেপিয়া দিতেছে। মাথার উপরে যেটুকু সূর্যের আলো দেখা যায় তাহাও তাহারা মুছিয়া দিয়া তাহাদের রাতের খেলার আয়োজন করিতেছে। চারিধারের জঙ্গল হইতে কত নাম- না জানা পাখি ডাকিয়া উঠিতেছে।

আমি বসিয়া বসিয়া আসমানীদের কথা ভাবিতেছিলাম। আমার উপদেশ কি আসমানীরা পালন করিবে? তাহারা লেখা পড়া শেখে নাই, সামান্য কয়টি স্বাস্থ্য-কথাও জানে না বলিয়া সমস্ত বাংলাদেশ ভরিয়া কত শত শত আসমানী মৃত্যুর কোলে ঢলিয়া পড়িতেছে। কে ইহাদিগকে রক্ষা করিবে? কে এই পচা পুকুর সাফ করিয়া এই পুকুরের পানিকে রোগের জীবাণু শূন্য করিবে? গাঁয়ে কে আসমানীর জন্য টিউবয়েল বসাইবে? আসামানীদের ভবিষ্যত আমার সম্মুখে অন্ধকারের চাইতেও অন্ধকার।

এমন সময় দূরের গ্রাম হইতে ঢোলের বাদ্য শুনিতে পাইলাম। সেই ঢোলের সঙ্গে তাল রাখিয়া সুন্দর সুরে অনেক লোকের গলার গান আমাকে পাগল করিয়া তুলিল। আমি ধীরে ধীরে সেই গানের আসরের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম।

সেখানে আসিয়া দেখি, কেরোসিনের একটি বড় ল্যাম্প জ্বালাইয়া গাজীর গানের আসর বসিয়াছে। ছেঁড়া মাদুরের উপর ম্যালেরিয়ায় জুবুথবু গাঁয়ের লোকেরা আসিয়া আসন গ্রহণ করিয়াছে। মাঝখানে দাঁড়াইয়া মোজাফফর গায়েন। হাতে চামর আর চাঁদ-আঁকা গাজীর 'আশা'। তাহা দোলাইয়া নানা রকম অঙ্গভঙ্গি করিয়া গায়েন আবদুল বাদশার কেচ্ছা বলিতেছে। গায়েনের গানের সুরে আর খোল ও দোতারার ঝঙ্কারে সভার সবগুলো মানুষ যেন দোল খাইতেছে। আমাদের সেই আসমানীও একধারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। কে বলে ইহাদের কোন দুঃখ আছে ? কে বলে ইহারা পেট ভরিয়া খাইতে পায় না! গায়েনের গানের সুরে গ্রাম হইতে যেন সব আপদ দূর হইয়া গিয়াছে। ঘন ঘন দাড়ি নাড়িয়া হাতে চামর দোলাইয়া গায়েন গান ধরিয়াছে-

তারিয়া নারিয়া নারে নারে।
আহা মন রে।
তার পরে কি হইল ?
বেটাপুত্র নাই আবদুল বাদশার ঘরে।
কাঁদছে আবদুল বাদশা জোড় মন্দির ঘরে।

তারপর এক সন্ন্যাসী আসিয়া আবদুল বাদশাকে এক গাছি শিকড় দিয়া গেল। আর বলিয়া গেল, "ওহে আবদুল বাদশা!

এই শিকড় বাটিয়া খেলে তোমার ঘরে যখন বেটাপুত্র হবে,
বারো বছর বয়স হইলে তাকে আমার হাতে সঁপিয়া দিবে।"
সুবুদ্ধি আছিল আবদুল বাদশার কুবুদ্ধি হইল,
সেই সন্ন্যাসীর কথায় সে স্বীকার পাইল।

তারপর সত্যই দশমাস দশদিন পরে বাদশা'র বেগমের এক পুত্র সন্তান হইল।

তার হাতে চন্দ্র, মুখে চন্দ্র, কপালে চন্দ্র জ্বলে,
পূর্ণমাসীর রাত্র যেন, শত তারা গলে।
এক, দুই, তিন করি বহুদিন যায়,
বারো বৎসর পরে সেই সন্ন্যাসী আসি
দাঁড়াইল বাদশার দরজায়।

তখন সেই পুত্রকে সন্ন্যাসীর হাতে সঁপিয়া দিতে মার বুকে কি কান্না। আবদুল বাদশার মাথায় যেন আসমান ভাঙ্গিয়া পড়িল। মা-বাপের পায়ে সালাম জানাইয়া যখন বাদশাজাদা বিদায় হইয়া চলিল তখন তাঁর শোকে শুধু বাদশার সভাসদ, উজীর, নাজিরই কাঁদিল না। এই অশিক্ষিত অনাহারী গরীব গাঁয়ের সকল ছেলে মেয়েও কাঁদিয়া জার জার হইল।

সভার একপাশে দাঁড়াইয়া পল্লীগ্রামের এই দুই রূপ দেখিয়া ভাবিয়া বিস্মিত হইলাম। এরা খাইতে পায় না, রোগে মহামারিতে গাছের শুকনো পাতার মত ঝরিয়া পড়ে, এও যেমন সত্য, গাজীর গানের আসরে, গানের সুরে আসমান হইতে স্বপ্নরাজ্য নামিয়া আসে; আর তারি মহিমায় এই সব গায়ের লোকেরা মুহূর্তের জন্য সব দুঃখ-কষ্ট ভুলিয়া যায়, এও তেমনি সত্য।

[illegible] আসমানীদের [illegible]

সেদিন আসমানীদের গ্রামে গেলাম। তাহাদের ছোট ঘরখানির অর্ধেক ঝড়ে উড়াইয়া লইয়া গিয়াছে। উঠানের চুলায় কি একটা রান্না হইতেছে। আসমানীর ছোট দুইটি ভাই বোন চুলার উপর সেই ফুটন্ত হাঁড়ীর দিকে অনিমেষ নয়নে তাকাইয়া আছে। আমাকে দেখিয়া আসমানী একটু ম্লান হাসিল। আমি একটু রহস্য করিয়া বলিলাম, "কিরে আসমানী! বড় যে রান্না-বান্না করিতেছিস ? আজ তবে তোদের এখানে না খাইয়া যাইব না"।

আমার কথায় আসমানী কাঁদিয়া ফেলিল। তার উস্কো খুস্কো চুলগুলির মধ্যে হাত বুলাইতে বুলাইতে আমি বলিলাম, "ছিঃ বোন। কাঁদিতে আছে ? কি হইয়াছে বলতো ?"

তার ময়লা আঁচল খানায় চোখের পানি মুছিয়া আসমানী বলিল, "কবিভাই! তুমি আজ আমাদের এখানে খাইবে, কতই খুশীর কথা। কিন্তু ঘরে তো আজ কিছুই নাই।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম-“এই যে রান্না হইতেছে ?”

আসমানী আমাকে একটু আড়ালে ডাকিয়া কানে কানে বলিল, “আজ দুই দিন আমাদের ঘরে কিছুই খাইবার নাই। ছোট ভাই বোন দুইটি বড়ই নির্বোধ; কিছুতেই বুঝিতে চাহে না। শুধু কাঁদে; ভাত দাও-ভাত দাও। ওদের ভুলাইবার জন্য চুলার উপরে শুধু পানি সিদ্ধ করিতেছি। মা গিয়াছে পাড়ায় কোথাও যদি কিছু ভিক্ষা করিয়া পায়। যদি কিছু লইয়া আসে তাই ওদের জাল দিয়া দিব।”

আমি কহিলাম, “আসমানী! তোদের এতো দুঃখ!”

আসমানী ম্লান হাসিয়া উত্তর করিল, “দুঃখের কথা আর কি কহিব কবিভাই, আমাদের মত জনম দুঃখী বুঝি আল্লাহর দুনিয়ায় নাই। কতদিন যে পেট ভরিয়া খাইতে পাই না তা আজ মনেও পড়ে না। আমার ছোট দুইটি ভাই-বোনের জন্যই চিন্তা! তারা ভাতের কষ্ট একেবারেই সহ্য করিতে পারে না। তাদের কান্নায় আমার বুক ফাটিয়া যায়।”

এমন সময় আসমানীর মা আসিল। আমাকে দেখিয়া আসমানীর মা তার ছেঁড়া ময়লা আঁচল খানা ঘোমটার মত করিয়া মাথায় দিতে ব্যর্থ চেষ্টা করিতে যেন লজ্জায় প্রাণান্ত হইতেছিল। আসমানী বলিল, “মা। লজ্জা করিও না। ইনি আমাদের কবিভাই। এর কথাতো কাল তোমাকে বলিয়াছি।” আসমানীর মা ঘরের এক কোণে জড়-সড় হইয়া বসিয়া রহিল।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, “আসমানীর মা! পাড়া হইতে ভিক্ষা করিয়া কি কিছু পাইয়াছ ?”

সে বলিল, “বাবারে! কে আমাদের ভিক্ষা দিবে ? সকাল হইতে দুপুর পর্যন্ত কত বাড়ি গেলাম, কেউ কিছু দিল না। সকলেরই অভাব। কে কি দিবে ? যাদের অবস্থা ভাল তাঁদের অন্তর আমাদের মত গরীবের জন্য কাঁদে না।”

আমি বলিলাম, “কেন কাঁদিবে না ? আয়তো আসমানী! তোকে সঙ্গে করিয়া ওই আদিল মাতব্বরের বাড়ি ঘুরিয়া আসি, নিশ্চয় তারা কিছু দিবে।”

আদিল মাতব্বর ব্যবসা করিয়া, কালোবাজারে ধান-চাউল বেচিয়া এত টাকা পয়সা করিয়াছে যে, লোকে বলে, তাহার সঞ্চিত টাকা পয়সার স্তুপের উপর দাঁড়াইয়া সে নাকি মক্কার ঘর অবধি দেখিতে পায়। সেই জন্য সে মক্কা শরীফে হজ্ব করিতে যায় না।

আদিল মাতব্বরের বাড়িতে গিয়া তাহার বৈঠকখানায় বসিলাম। আসমানীকে আমার পাশে বসিতে বলিলাম। কিন্তু আসমানী সেই ধোপদোরস্ত বিছানার উপর কিছুতেই বসিতে রাজি হইল না। সে আমার পাশে দাঁড়াইয়া রহিল।

মাতব্বর সাহেবকে খবর পাঠাইলাম। প্রায় ঘন্টা খানেক আমাদের অপেক্ষা করাইয়া মাতব্বর সাহেব বাড়ির ভিতর হইতে আসিলেন।

আমাকে দেখিয়া বলিলেন, "এই যে কবি ভাই! আদাব! আদাব! তা কি মনে করিয়া? আমার কথা তো আপনার মনেই থাকে না। এই সাত গ্রামের মধ্যে আমিই একমাত্র বড়লোক! আপনাকে কত বলিলাম, আমার উপরে একটা ভাল কবিতা লিখিয়া দিন। বেশ আমার গুণপনার প্রশংসা করিয়া, যাহাতে জেলার মেজিস্ট্রেট সাহেব আমাকে তারিফ করেন; তা আপনি কানেই তুলিলেন না।"

আমি বলিলাম, "মাতব্বর সাহেব! ভাল কাজ করুণ; দেশের লোকের উপকার করুন। কত কবি আপনার উপর কবিতা লিখিবে।"

মাতব্বর সাহেব বলিলেন, 'ভাল কাজের কথা বলিবেন না কবি ভাই। ভাল কাজ আমার মতন কে করে? সেবার দারোগা সাহেব আসিলেন গ্রামে। কেউ তাঁহাকে আদর-আপ্যায়ণ করিতে রাজি হইল না। আর করিবে কে, কোনো বাপের বেটার ঘরেই চাউল-ডাউল নাই। তখন এই আমিই তো দারোগা সাহেবকে তিন-চার দিন আমার বাড়িতে রাখিয়া খানা-পিনা খিলাইলাম। ইহাতে আমার প্রায় এক হাজার টাকা খরচ হইয়া গেল। বলুন তো কবি ভাই! এই বাজারে টাকা খরচ করিয়া আমি সমস্ত গাঁয়ের সম্মান রাখিলাম কি না?"

এ কথার আমি আর কি উত্তর দিব। মনে মনে ভাবিলাম যে গ্রামের সব লোক খাইতে পায় না, সে গ্রামের মাতব্বর তার দেশের ভাইদের কথা না ভাবিয়া হাজার টাকা খরচ করিয়া দারোগা সাহেবকে খানা-পিনা দিলেন।

দারোগা সাহেব তো আমাদের সরকারের চাকর। তিনি যদি গ্রামে আসিয়া থাকেন তার জন্য রাষ্ট্রের নিকট উপযুক্ত বেতন পাইয়াছেন। হাজার টাকা খরচ করিয়া তাঁকে খানাপিনা দিয়া কেন তিনি গ্রামের সম্মান রক্ষা করিতে গেলেন?

তার কারণ, মাতব্বর সাহেব চোরা বাজারে কারবার করেন। দারোগা সাহেবকে খুশী করিয়া সেই চোরাবাজারের পথকে কন্টক মুক্ত করিলেন।

আমাকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া মাতব্বর সাহেব বলিলেন, 'কি কবি ভাই! কথা বলেন না যে? ভাল কাজের কথা বলিলেন? ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের বাড়িতে সেদিন তিনটা খাসী আর আধ মণ ঘি দিয়া আসিলাম, কিন্তু ফায়দা হইল কি? বারই ডাঙ্গার চাউল বেচার ভার তিনি করিমদ্দি বেপারীর হাতে ছাড়িয়া দিলেন। এই একচোখ কানা ম্যাজিস্ট্রেটগুলোর জ্বালায় তো অস্থির হইলাম। তা কবি ভাই! একটা কাজ করিতে পারেন? ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকে আমার এখানে দাওয়াত দিতে চাই। একটা ভাল কবিতা লিখিয়া দিতে পারেন, যাতে তিনি খুশী হইয়া যান?"

উত্তরে বলিলাম, "আমি তো এদের উপরে কবিতা লিখতে জানি না।"

"তা লিখিবেন কেন? আপনার কবিতা তো সেই ঠ্যাং ভাঙিয়াছে কারত পুতুলের; বাচ্চা মরিয়াছে কার কালো গাই-এর, আর যারা গরীব; খাইতে পায় না তাদের লইয়া।"

মাতব্বর সাহেব খিঁচাইয়া উঠিলেন। "আরে কবি সাহেব! কথা শোনেন, আল্লা যাদের গরীব করিয়াছে, আপনি কবিতা লিখিয়া তাদের কতটা কি করিবেন? তার চাইতে বড় লোকদের উপর কবিতা লিখুন, আখেরে আপনার ভাল হইবে! এই যে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কথা বলিলাম, বেশ তারিফ করিয়া একটা কবিতা লিখিয়া দেন। চাই কি? সাহেব খুশী হইয়া আপনার একটা ভাল চাকরি করিয়াও দিতে পারেন।"

আমি বলিলাম, "আমার চাকরির কোন প্রয়োজন নাই। আপাতত ঃ আপনি এই গরীব মেয়েটির জন্য কিছু করেন। আজ তিন দিন এরা কিছু খায় নাই।"

এবার মাতব্বর সাহেব নিজ মূর্তি ধারণ করিলেন। "ওই হতভাগী ছুঁড়িটা বুঝি আপনার পাছ ধরিয়াছে। কবি সাহেব! কিছুতেই ওকে আস্কারা দিবেন

না। এই সব নিত্য-ভুখা লোকের ক্ষুধা কি কেউ মিটাইতে পারে? আজ কিছু দিলে-কাল আবার আসিয়া বিরক্ত করিবে। ওরে কে আছিস, ওই ছুঁড়িটাকে তাড়াইয়া দে-তো।"

মাতব্বর সাহেবের চাকর আসিয়া আসমানীর হাত ধরিতেছিল। আমি বাধা দিলাম। তারপর বলিলাম, "মাতব্বর সাহেব! আপনার এত টাকা। আসমানীকে সামান্য কিছু দান করিলেন না। দেখিতেছেন না, ক্ষুধায় ওর মুখখানা কেমন শুকাইয়া গিয়াছে? আপনার ঘরেও তো কচি ছেলে মেয়ে আছে।"

মাতব্বর সাহেব রুক্ষভাবে উত্তর করিলেন, "কবি সাহেব! আমি এখানে খয়রাতি-খানা খুলিয়া বসি নাই। আমার অনেক কাজ। এখন তবে আপনি আসুন।" এই বলিয়া মাতব্বর সাহেব অন্দরে চলিয়া গেলেন। আমি আসমানীর হাত ধরিয়া রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইলাম।

৩। পীর সাহেবের বাড়ি

আসমানীকে সঙ্গে লইয়া আরও দুই তিন জায়গায় গেলাম, কিন্তু কেহই আসমানীদের সাহায্য করিতে চাহিল না। সব চাইতে দুঃখ হইল পীর সাহেবের বাড়িতে যাইয়া। গ্রামের মধ্যে ওয়ালীউল্লাহ পীর সাহেব। কত বড় তার নাম ডাক! দেশে বিদেশে শার্করেদ-মুরীদের অন্ত নাই। তার পুকুরে অনেকগুলি বড় বড় গজার মাছ পোষা হয়। প্রতিদিন সেই গজার মাছগুলির খাইবার জন্য আধমণ খানেক চাউল পুকুরে ছুঁড়িয়া ফেলেন। যে লোকটি পুকুরে চাউল ফেলিয়া দিতেছিল আমি যাইয়া তাহাকে বলিলাম, "ভাই সাহেব! প্রতিদিন এই যে আধমণ চাউল পুকুরে ফেলিয়া দিতেছেন, জানেন দেশের কত লোক না খাইয়া মরিতেছে? আপনার এই আধমণ চাউল হইলে অন্ততঃ প্রতিদিন দেশের ৫০ জন লোককে অনাহারের হাত হইতে বাঁচানো যাইত।"

লোকটি আমার দিকে চাহিয়া বিদ্রুপ করিয়া বলিল-"মিঞা সাহেব! আপনার খয়রাতি উপদেশে এখানে কোন কাজ হইবে না। জানেন, আমাদের পীর সাহেব বলিয়াছেন, এই মাছগুলিকে ভাল মত খাওয়াইলে রোজ-হাশরের বিচারের দিন এরা আল্লাহর কাছে যাইয়া তারিফ করিবে আর বলিবে, "আয় খোদা পাক পরওয়ার! বদ্ধপানির মধ্যে যাহারা আমাদিগকে খাইতে দিয়াছিল,

তুমি আজ বিচারের দিন তাহাদিগের গুনাহ্ মাফ কর," এই কথা বলিতে বলিতে সেই লোকটির চোখ দুটি ছল ছল করিয়া উঠিল। পাশের লোকেরা দুই হাত তুলিয়া মোনাজাত করিল।

আমি বলিলাম, "ভাই সাহেব! এই যে ছোট্ট মেয়ে আসমানীকে দেখিতে পাইতেছেন, সে তিনদিন খাইতে পায় নাই। একে আজ না খাওয়াইয়া এই মাছগুলোকে খাইতে দিলে রোজ হাসরের বিচারের দিন আল্লা কি সেজন্য আপনাদের মাফ করিবেন ? এরা বাঁচিয়া থাকিলে হয়ত কত ভাল কাজ করিবে, এদের ছেলেমেয়েরা মাটিতে লাঙ্গলের আঁচড় কাটিয়া দেশের হাজার হাজার লোকের জন্য ফসল ফলাইবে। আপনি সেই মানুষকে ঠকাইয়া তাহার খাদ্য মাছগুলিকে দিয়া খাওয়াইতেছেন। এই মাছগুলোওতো মানুষের খাদ্য হইতে পারিত। এইগুলি খাইয়া বহু লোকের জীবন বাঁচিয়া যাইত।"

আমার কথা শুনিয়া লোকটি শিহরিয়া উঠিয়া কানে আঙ্গুল দিয়া বলিল, "মিঞা সাহেব! এমন গুনাহ্র কথা মুখেও আনিবেন না। এগুলি খোদাই মাছ। এদের অজিফার কথা কল্পনা করিলেও দোজখে যাইতে হইবে। আপনি শিগ্গীর এখান হইতে চলিয়া যান নতুবা অপমান হইবেন।"

লোকটি আমার দিকে কট্মট্ করিয়া চাহিল। অবস্থা বেগতিক দেখিয়া আমি আসমানীকে সঙ্গে করিয়া খোদ পীর সাহেবের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

একটি সুন্দর বিছানার উপর বসিয়া পীর সাহেব চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ঢুলিয়া ঢুলিয়া কি যেন অস্পষ্ট ভাবে উচ্চারণ করিতেছিলেন। সামনে অনেকগুলি গ্রাম্য লোক ভক্তিপূর্ণ চোখে পীর সাহেবের দিকে চাহিয়াছিল। পীর সাহেবের মুখে সুন্দর সাদা দাড়ি, তাহার কতকাংশে লাল রঙের খেছাব মাখান। অঙ্গ হইতে সুন্দর আতরের গন্ধ ভাসিয়া আসিতেছে। সামনের লোবানদানীতে ধোঁয়া, পীর সাহেবের অঙ্গ দোলানীর অনুসরণে বাতাসের সঙ্গে ঘুরিতেছে।

অনেকক্ষণ পরে পীর সাহেব চক্ষু মেলিলেন। তারপর মৃদু হাসিয়া সামনের লোকদের আপ্যায়িত করিলেন। কেউ দশ টাকা; পাঁচ টাকা, কেহবা নতুন বস্ত্র, সুন্দর উপাদেয় খাদ্য, নানা রকমের উপহার পীর সাহেবের সামনে ধরিলেন। পীর সাহেব যেন সেগুলির দিকে খেয়ালই করিলেন না। যেন তিনি অন্য কোন এক জগতের লোক, এইভাবে গুণ গুণ করিয়া কি একটা

গান গাহিতে লাগিলেন।

আমি একটু কাশিয়া পীর সাহেবের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিলাম, "পীর সাহেব! আমার একটি আরজ আছে।"

পীর সাহেব অতি নম্রভাবে আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "কি কথা বল।"

আমি বলিলাম, "এই মেয়েটি তিনদিন কিছু খায় নাই। ওর ছোট দুইটি ভাই বোন অনাহারে চিৎকার করিয়া কাঁদিতেছে।"

পীর সাহেব আরও আদরের সঙ্গে আমাকে বলিলেন, "তা আমি কি করিতে পারি? আমি এদের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করিব।"

আমি বলিলাম, "পীর সাহেব! দোয়াতে এদের পেট ভরিবে না। আপনি এদের জন্য কিছু দান করুন।"

পীর সাহেব মোলায়েম স্বরে উত্তর করিলেন, "বাবা আমি নিজেই ভিখারী মানুষ, এইত দেখিতে পাইতেছেন না, এরা দয়া করিয়া যাহা দেয় তাতেই আমার কোন রকমে চলিয়া যায়। আমি আসমানীদের জন্য কি করিতে পারি?"

আমি উত্তর করিলাম, "পীর সাহেব! প্রতিদিন অন্ততঃ একশত টাকা আপনি শিষ্যদের কাছ হইতে সেলামী পাইয়া থাকেন। ইহা হইতে একটি টাকা আসমানীদের দান করুন।"

পীর সাহেব জিভ কাটিয়া বলিলেন, "আমি দান করিবার কে ? আল্লাহ আমাকে যা দিয়াছেন তাহা আমার ঈমানদারীর জন্যই আমাকে দিয়াছেন। আল্লাহ যাহাদের গরীব করিয়াছেন আমি তাহাদের দান করিব এত বড় বুকের পাটা আমার নাই। আল্লাহ যদি চাহিতেন তাহা হইলে তিনি নিজেই এদের দিতে পারিতেন।"

পীর সাহেবের কথাগুলি হইতে যেন মধু ঝরিয়া পড়িতেছিল। আমি উত্তরে কিঁ বলিতে যাইতেছিলাম এমন সময় সমবেত শিষ্যদের মধ্য হইতে একজন বলিল, "আরে মিঞা সাহেব! কেন আমাদের হুজুরের সঙ্গে তর্ক করিতে আসিয়াছেন। আপনার সঙ্গে এই সব বাজে কথা বলিয়া হুজুরের এবাদত বন্দেগীর দেরী করিয়া ফেলিতেছেন। জানেন, আমাদের হুজুর দুনিয়াদারীর ধার ধারেন না। আপনি এখন চলিয়া যান।"

পীর সাহেব তাহাদের দিকে চাহিয়া মৃদু হাসিয়া আবার চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। আসমানীর হাত ধরিয়া বাহিরে চলিয়া আসিলাম। আমার কেবলই কান্না

পাইতে লাগিল। কোন্ আল্লার এবাদত করিবেন এই পীর সাহেব ? আল্লার বান্দাদের দুঃখে যার প্রাণ কাঁদে না তার এবাদৎ বন্দেগী কি আল্লাহ কবুল করিবেন?

৭ ☐ পীর সাহেবের ছেলেমেয়ে

পথে আসিতে আসিতে পীর সাহেবের তিন চারটি ছেলেমেয়েকে এক জায়গায় নাস্তা খাইতে দেখিলাম। পরোটা গোস্ত আর ফিরনি, কতক খাইতেছে আর কতক ফেলিয়া দিতেছে। সামনে একটা লোলুপ কুকুরও কয়েকটি কাক তাহা লইয়া কাড়াকাড়ি করিতেছে।" আমি তাহাদের কাছে যাইয়া বলিলাম-"সোনা মণিরা! আমি তোমাদের সঙ্গে একটু কথা বলি?' ছোট্ট মেয়ে দুইটি আমাকে দেখিয়া একটু ভয় পাইল, কিন্তু ছেলেটি আগাইয়া আসিয়া বলিল, ..."নিশ্চয় বলিতে পারেন, বলুন।"

আমি তাকে আদর করিয়া বলিলাম, "খোকা ভাই! এই যে তোমরা খাবার খাইতেছ, কতক ফেলিয়া দিতেছ, কতক পায়ে চটকাইয়া মাটিতে পিষিয়া নষ্ট করিতেছ। কিন্তু জান ? আমাদের দেশের কত লোক না খাইয়া মরিতেছে। ইহার জন্য তোমরা দায়ী হইবে।" ছেলেটি বলিল, "আমাদের খাবার আমরা ছড়াইয়া ফেলি আর যাই করি তাতে আপনার কি! আর দেশের লোক না খাইয়া মরিতেছে সে জন্য আমরাই বা দায়ী হইতে যাইব কেন ? আমরা কতটুকুই বা খাদ্য ছড়াইয়া ফেলি! তার জন্য দেশের শতশত লোকের জীবন নষ্ট হইবে কেমন করিয়া?"

আমি বলিলাম, "খোকা ভাই! শোন! তুমিতো একা নও। তোমার মত শতশত খোকা ভাই অমনি করিয়া কত জায়গায় নিজের খাবার কতক খাইতেছে, কতক ছড়াইয়া ফেলিতেছে। সমস্ত দেশে তোমার মত কত খোকা আছে হাজার-হাজার লক্ষ- লক্ষ। তারা যা ফেলিয়া দেয়, সেই সব খাদ্য একত্র করিলে কত হয় বলতো দেখি একটা পাহাড় পরিমাণ হয় কিনা।"

খোকা ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "তা হয়।" আমি বলিলাম, "তবে দেখ তো খোকন ভাই! এই খাবারগুলি তোমরা যদি নষ্ট না করিতে, তবে তা গরীব লোকেরা পাইত।" "খোকা জিজ্ঞেস করিল, "কেমন করিয়া বলতো ?"

আমি বলিলাম, "শোন তবে, তোমাদের মাসে যা খাবার দরকার হয়- তোমার আব্বা তা বাজার হইতে খরিদ করেন। তোমরা যদি খাদ্য নষ্ট না কর তবে তোমার আব্বা তোমাদের জন্য কম খাদ্য খরিদ করিবেন।"

খোকা বলিল, "সে আর কতটা কম ? আমরা তো অতি সামান্য খাদ্যই নষ্ট করি।"

আমি বলিলাম, "না খোকা! সামান্য নয়। প্রতিদিন তোমরা চার পাঁচ বার খাও। এ বাড়িতে তোমরা তিন ভাইবোন, বল তো মাসে কি পরিমাণ খাদ্য তোমরা নষ্ট কর?"

এমনি হাজার-হাজার কোটি-কোটি ছেলে মেয়ে খাবার নষ্ট করিতেছে। মনে মনে ভাবিয়া দেখিও। প্রতিদিন, প্রতি বছরে কতখাবার নষ্ট হইতেছে। এই খাবারগুলো যদি নষ্ট না হইত, তোমাদের পিতা মাতারা যদি অতিরিক্ত এই খাবারগুলি না কিনিত তবে বাজারে চাল-ডালের দাম কমিত। মাছ-তরকারির দাম কমিত। গরীব লোকেরা সস্তাদরে খাবার জিনিষ কিনিতে পারিত। দেশের খাদ্য সামগ্রীর একটা পরিমাণ আছে। তার বেশি পাওয়া যায় না। সেই জন্যেই বলিতেছিলাম, খাবার জিনিস ছড়াইয়া খাইও না।

ছেলেটি আমার কথায় লজ্জিত হইয়া বলিল, "কবি ভাই! তুমি সত্য কথাই বলিয়াছ। আজ হইতে আমরা আর খাদ্য নষ্ট করিব না। কি বলিসরে বুলি, লিলি ?

খোকার ছোট্ট বোন দুইটি একটু দূরে দাঁড়াইয়া সব কথাই শুনিতেছিল। তাহারা লজ্জা লজ্জা ভাব মিশাইয়া মাথা নাড়িয়া সাঁয় দিল, তাহারা আর খাদ্য নষ্ট করিবে না।

খোকার বোন দুইটি জড়-সড় হইয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "কবি ভাই আমার একটা কথা।"

আমি বলিলাম, "কি কথা বুবু-জান ?"

সে বলিল, "এই যে খাবার জিনিস নষ্ট করার কথা তুমি আমাদের বুঝাইয়া বলিলে, আমরা তো আর খাবার জিনিষ নষ্ট করিব না। কিন্তু তুমি যে বলিলে, দেশে আরও কত খোকা-খুকু আছে তারাও তো এমনি খাবার জিনিস নষ্ট করিতেছে। তাহাদের তুমি কেমন করিয়া বুঝাইবে ?"

আমি উত্তর করিলাম, "এসব কথা চিঠিতে লিখিয়া আমার দেশের সব খোকা-খুকুদের সব জায়গায় পাঠাইয়া দিব। আমার চিঠি পড়িয়া তোমাদের

মতনই তাহারা সাবধানী হইবে। যারা চিঠি পড়িবে না তাদেরও তাহারা এসব কথা বুঝাইয়া বলিবে। তোমরা কি আমার কথা তোমাদের বন্ধুদের বলিবে না ?" তাহারা ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'নিশ্চয় বলিব।"

আমি বলিলাম, "সোনামণিরা আমার কথা যে, তোমরা এত সহজে বুঝিতে পারিলে সেই জন্য আমার অনেক ধন্যবাদ। আজ হইতে মনে রাখিও এতটুকু খাবার নষ্ট করিয়া ফেলা মানে, তোমাদের মত ছোট ছোট খোকাখুকুকে গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলা।"

এই যে আসমানীকে দেখিতে পাইতেছ,-"আমার কথা শেষ না হইতেই পীর সাহেবের সেই শিষ্যটি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি আমাকে দেখিয়া তেলে বেগুনে জ্বলিয়া উঠিলেন, "আরে মিঞা সাহেব। আপনার তো শরম নাই। এই লোভী মেয়েটিকে লইয়া এদের খাবার সামনে আসিয়াছেন ইহার নজর লাগিয়াছে খাবারগুলোর উপর। এগুলো খাইলে পীর সাহেবের ছেলেমেয়েদের পেটে অসুখ হইবে।"

এই বলিয়া লোকটি ছেলেমেয়েদের থালা হতে খাবারগুলি তুলিয়া কুকুরের সামনে ছুঁড়িয়া ফেলিল।

"আসমানী এবার কাঁদিয়া ফেলিল। সে আমার পা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "কবি ভাই, আমাকে সঙ্গে আনিয়া তুমি কত জায়গায় অপমান হইলে। আর কাজ নাই লোকের কাছে ঘুরিয়া। আল্লাহ যখন আমাদের দিকে চাহিলেন না, তখন আপনি আর কতটুকু কি করিবেন আমাদের জন্য ?" অতটুকু মেয়ে দুঃখ দুর্দ্দশায় আজ সে এত কথা বলিতে শিখিয়াছে।

আসমানীর হাতটি ধরিয়া পথে আসিতে আসিতে বলিলাম, 'আসমানী! তুই কাঁদিস না, খোদা তোদের মরিতে পাঠান নাই, শুধু মানুষ তোদের না খাওয়াইয়া মারিতেছে।" বলিতে বলিতে নিজেই কাঁদিয়া ফেলিলাম, সত্যই কি তবে আসমানীদের জন্য কেউ কাঁদিবেনা-ভাবিবে না? অমন ফুলের মত সুন্দর মেয়েটি না খাইয়া মরিবে! খোদা তুমি এদের দিকে একবার ফিরিয়া তাকাও।

৮ □ বুড়ী মা

আসমানীকে সঙ্গে করিয়া যাইতেছি। একটা বুড়ী প্রকান্ড একটা কাঁঠাল কাঁধে করিয়া হাঁফাইতে হাঁফাইতে পথ চলিয়াছে। আমাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল; "বাবা! পীর সাহেবের বাড়ী কোনদিকে ?"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,"বুড়ীমা! তুমি পীর সাহেবের বাড়ী যাইতেছ কেন?"

কাধের কাঁঠালটি নামাইয়া হাঁফাইতে হাঁফাইতে বুড়ী বলিল, "বাবা! আমার গাছের প্রথম কাঁঠালটি আমি পীর সাহেবের নামে মানত করিয়াছি, তাই পীর সাহেবকে এটা দিতে আসিয়াছি। আমার বাড়ি এখান হইতে পাঁচ মাইল দূরে। এতবড় কাঁঠাল আমি বুড়া মানুষ বহিয়া আনিতে যে কি হয়রান হইয়া পড়িয়াছি!"

আমি বলিলাম, "বুড়ী মা! তোমার গায়ে তো ছেঁড়া কাপড়। অবস্থা নিশ্চয়ই ভাল না।"

বুড়ী বলিল, "বাবা! একবেলা খাই আর এক বেলা না খাইয়া থাকি। ছেলে পেলে নাই। এবাড়ি-ওবাড়ি কাজ করিয়া যাহা পাই তাহাতে এক বেলার বেশি খাওয়া জোটে না।"

বুড়ীকে আদরের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করিলাম,"আচ্ছা বুড়ী মা! তোমার কি ছেলে-পেলে কোনদিনই ছিল না?

বুড়ী বলিল, "বাবারে সে দুঃখের কাহিনী আর কেমন করিয়া বলিব। গাজী বাড়ির মেয়ে আমি। আথাল ভরা গরু ছিল, উঠান ভরিয়া বারো মাসের বারো ফসল গড়াগড়ি করিত। কোল ভরিয়া তিন চারটি ছেলেমেয়ে ছিল। তাদের হুল্লায় সমস্ত বাড়ি দিন রাত্তির মাতিয়া থাকিত।"

"তাদের কি হইল বুড়ী মা?" জিজ্ঞাসা করিলাম।

বুড়ী বলিল, -"বাবারে! সে দুঃখের কাহিনী কহিয়া ফুরাইবার নয়। সব শেষ হইয়া একটি মাত্র ছেলে ছিল। গত অঘ্রাণ মাসে সে আমাকে ফাঁকি দিয়া চলিয়া গিয়াছে। গজারী গাছের মত মোটা ছিল বাবার হাত পা। জন খাটিয়া খাইত। আমাকে বলিত, "মা! আর কয়টা দিন সবুর কর। কিছু টাকা জমাইয়াই আমি হাল লাঙল করিব। তোমার কোন কষ্ট হইবে না।" বাবার মুখের দিকে চাহিয়া পরাণ জুড়াইয়া যাইত।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আচ্ছা বুড়ীমা! তোমার ছেলে কি করিয়া মরিল?"

বুড়ী বলিল,"ব্যারাম কিছুই নয়রে বাবা, তিন চারিবার ভেদ বমি হইল, তারপর বাবা আমার আর কথা বলিল না। বাবার মুখে আর মা ডাক শুনিলাম না।"

কহিলাম-"তবে তোমার ছেলে কলেরা হইয়া মরিয়াছে। আচ্ছা বুড়িমা, সরকার হইতে তো ডাক্তার সাহেব কলেরা না হওয়ার জন্য টিকা দিয়া যায়। তোমার গ্রামে কি কলেরার টিকা দেওয়ার ডাক্তার আসে নাই ?"

বুড়ী বলিল, "আসিয়াছিল রে বাবা, কিন্তু আমরা যে পীর সাহেবের শিষ্য। তিনি তখন আমাদের গ্রামে ছিলেন। তিনি হুকুম দিলেন, তোমরা কেহ ডাক্তারের টিকা লইও না। আমি গ্রাম, মন্তর দিয়া বন্ধ করিয়া দিয়াছি। গ্রামে কলেরা আসিবে না।"

"তোমরা পীর সাহেবের কথা শুনিলে?" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম।

বুড়ী বলিল, "শুনিব না ? তিনি হইলেন আমাদের পীর। ডাক্তার সাহেবও খুব ভাল লোক। কত পীড়াপীড়ি করিলেন, কত ভয় দেখাইলেন। বাবা আমার একবার রাজী হইতেছিল। কিন্তু পীর সাহেব তাকে ধমকাইয়া দিলেন। তিনি বলিলেন, "আল্লাহর উপর খোদকারী করিতে চাও? আল্লাহ যদি মারেন তবে কেহ রক্ষা করিত পারিবে না। আল্লার উপর ভরসা করিয়া রহিলাম কিন্তু কোলের মাণিক আল্লাহ কাড়িয়া লইয়া গেলেন। দুঃখিনীর বুকে বেহেস্ত আনিয়া দিয়াছিলেন, তাহা আমার সহ্য হইল না।"

আমি বলিলাম, "বুড়ীমা! তোমার ছেলেকে আল্লাহ মারেন নাই। এই পীর সাহেব মারিয়াছেন। তোমার ছেলে যদি কলেরার টিকা লইত তবে কিছুতেই তাহার কলেরা হইত না।"

বুড়ী কানে আঙ্গুল দিয়া বলিল, "বাবারে! এমন কথা বলিও না। তিনি আমাদের পীর। ওমন কথা শুনিলে গুনাহ্ হইবে!"

আমি কহিলাম, "বুড়ীমা! আর একটি কথা, এই কাঁঠালটি তুমি নিজে না খাইয়া পীর সাহেবের জন্য আনিয়াছ কেন ?"

বুড়ী বলিল, "বাবারে! তুমি একেবারেই অবুঝ। তিনি যে, আমাদের পীর। সেবার তিনি আমাদের পাড়ায় গেলেন। ছেলের শোকে পাগলিনী। আমাকে ডাকিয়া কত মুলালিম করিয়া তিনি বলিলেন, "তোর গাছের প্রথম কাঁঠালটি পাকিলে আমার দরগায় দিয়া আসিস।' তাহার কথা না মানিয়া পারি? কত বড় বড় লোকে কত সব ভাল ভাল জিনিস তেনাকে দেন। গরীবের সামান্য

কাঁঠালটি যে তিনি লইতে চাহিয়াছেন এটা কি আমার কম ভাগ্য ?”

বুড়ীর কথার কী আর উত্তর দিব ? মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম এই সব ভন্ডপীর এমনি করিয়া গ্রামে কত হতভাগিনীকে ঠকাইতেছে। ধর্মের নামে, আল্লার নামে মানুষকে ইহারা ভুল বুঝাইতেছে। আমার ছোট ছোট খোকাখুকু ভাইবোনেরা কবে বড় হইবে, কবে এইসব ভন্ডের হাত হইতে দেশের সরল প্রাণ লোকদিগকে রক্ষা করিবে।

খানিকক্ষণ জিড়াইয়া বহুকষ্টে কাঁঠালটি কাঁকালে করিয়া বুড়ী আবার সেই আকাবাঁকা গ্রাম্য পথে রওয়ানা হইল। মাথার উপর দুপুরের প্রখর গুমট রৌদ্র বাতাসে হু-হু করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছে। সন্তান হারা জীর্ণদেহ এই বুড়ীর কাঁকাল খানি কাঁঠালের ভারে ভাঙ্গিয়া পড়িতে চাহে। তবু সে পীর সাহেবের বাড়ি বলিয়া ধীরে ধীরে পা ফেলিয়া চলিয়াছে।

এই বুড়ী যেন যুগ-যুগান্তরের সকল অবিচারের জীবন্ত ফরিয়াদ। আল্লার দুনিয়ায় এই অত্যাচার কেমন করিয়া সহ্য করিতেছে ?

মানস নয়নে দেখিতে পাইলাম গ্রামের সেই ভন্ড পীর দাড়িতে খেছাব মাখাইয়া বসিয়া আছে, আর মিথ্যা কতকগুলি অন্ধ বিশ্বাসে ভুলাইয়া এই অনাহারী বৃদ্ধা মেয়েটিকে সুদূর গ্রাম হইতে টানিয়া আনিতেছে। কত পরিশ্রমে এই গাছের প্রথম ফলটি সে হাসি মুখে দিয়া যাইবে সেই ভোজন বিলাসী ভন্ড পীরের দরবারে। তারপর সে নিজে দিনের পর দিন অনাহারে কাটাইবে।

৯ □ আমার কবি ভাই

বেশী সময় এইভাবে চিন্তা করিতে পারিলাম না। অনাহারে আসমানীর মুখ ক্রমে কাল হইয়া আসিতেছে। আর কতক্ষণ সে, আমার সঙ্গে হাঁটিতে পারিবে কে জানে? খোদা তুমি কি আজ আসমানীর দিকে মুখ তুলিয়া চাহিবে না ?

আসমানীকে সঙ্গে করিয়া গ্রামের বন্দরে আসিলাম। এখানে কে আসমানীকে দয়া করিবে?

সামনে দেখিলাম একটা মিঠাইর দোকান, ভাবিলাম, দোকানদারের কাছে কাকুতি মিনতি করিয়া সামান্য কিছু খাবার চাহিয়া আসমানীকে দিব।

দোকানের কাছে যাইয়া দেখি আমার কয়েকটি ছোট ছোট ভাই সেখানে বসিয়া মিঠাই খাইতেছে। তাহারা আমাকে দেখিয়াই ডাক দিল, "এই যে, কবি ভাই! আসুন আসুন আমাদের সঙ্গে মিঠাই খাইবেন।"

একটি ভাই আমাকে দেখিয়া দোকানের মধ্যে টানিয়া লইয়া যায় আর কি।

আমি বলিলাম, "আমি তো একা নই। আমার সঙ্গে আসমানীও আছে।" সে বলিল, "আসমানীকে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছেন! আমরা আসমানীকে দেখিব।"

আমি বলিলাম, "লোকের মুখে আসমানীর নাম শুনিয়া তোমরা ত তার সঙ্গে আলাপ করিতে চাহিয়াছিলে, এই দেখ, আসমানী আসিয়াছে।"

তিন চারটি ছেলে দৌড়াইয়া আসিয়া আসমানীকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। তারপর কলরব করিয়া তাহারা আমাদিগকে দোকানের মধ্যে লইয়া গেল। আমি বলিলাম,"সোনা ভাইরা! এখানে আমরা পাঁচ ছয় জন মিলিয়া যদি মিঠাই খাই, তবে পাঁচ ছয়টি টাকা খরচ হইবে।"

ছেলেরা বলিল-"তা হোক আজ আপনাকে লইয়া আমাদের উৎসব।"

উত্তরে আমি বলিলাম, "আসমানীরা আজ তিন দিন খায় নাই। এস আমরা কেউ কিছু না খাইয়া এই টাকা দিয়া চাউল কিনিয়া আসমানীদের দিয়া আসি।"

ছেলেরা তৎক্ষণাৎ রাজি হইল। দোকান হইতে চাল-ডাল কিনিয়া আসমানীদের বাড়িতে দিয়া আসিলাম। আসমানীর মা আমার ছোট ছোট ভাইদের কতই না দোয়া করিল।

ফিরিবার সময় ছেলেরা বলিল, "কবিভাই! তুমি যে সেবার ঠ্যাং ভাংগা একটা কুকুরের উপর কবিতা লিখিয়াছিলে সেটি আমাদিগকে শুনাইতে হইবে।"

আর একটি ছেলে বলিল, "না কবি ভাই! শুধু সেটি নয়, সেই যে দুষ্টু ছেলেটা পাখির বাসা হইতে ছানা দুইটি পাড়িয়া আনিয়াছিল, তখন পাখির মা কেমন করিয়া কাঁদিয়াছিল সেই কবিতাটিও শুনাইতে হইবে। দুপুরের রৌদ্রে বটগাছের ছায়ায় আমার ছোট ছোট ভাইদের লইয়া সেদিনকার কবিতার আসরটি বেশ ভাল ভাবেই জমিয়া উঠিয়াছিল।

১০ □ কবি ভাইর আস্তানা

এবার ভাবিলাম আসমানীদের গ্রামের এক পাশে একটা ছোট্ট কুঁড়েঘর বাঁধিয়া কিছুদিন ওদের সঙ্গে কাটাইব। আমার ছোট ছোট ভাইদের ডাকিলাম আসমানীও আসিল। তাহারা ঝাড় হইতে বাঁশ কাটিয়া সেই বাঁশের খুটি পুতিয়া আমার জন্য কোন রকমে একখানা ঘর তৈরি করিল। গোলপাতা দিয়া ঘরের ছাউনি হইল।

আসমানী বলিল, “কবি ভাই! তোমার ঘরের যদি দেওয়াল থাকিত তবে আমি লাল মাটি দিয়া তার উপরে নকসা আঁকিয়া দিতাম।”

ছেলেরা বলিল, “সে আর এমন অসম্ভব কি? এসো ভাই! মাটি-কাঁদা করিয়া কবিভাইর ঘরের দেয়াল তৈরি করিয়া দেই।” তিন চার দিনে ঘরের দেয়ালও তৈরি হইয়া গেল। সেই দেয়াল শুকাইতেও আরো পাঁচ ছয় দিন লাগিল। তখন সেই ঘরের দেয়ালে লাল মাটি আর খড়ি মাটি দিয়া আসমানী নকসা আঁকিতে লাগিল। আমি ঘরের মেঝেতে পদ্মপাতা বিছাইয়া তার উপরে বসিয়া কবিতা লিখিতে লাগিলাম।

আসমানী ঘরের দেয়ালে কত হিজিবিজি ছবি আঁকিতে লাগিল। প্রথমে আঁকিল সেই ঠ্যাং ভাঙা পুতুলটি, সেটি কোলে করিয়া পুতুলের ছোট্ট খুকুমণিটি একপাশে বসিয়া কাঁদিতেছে। তারপর সে আরও অনেক গুলি ছবি আঁকিল। ছেলেরাও বসিয়া রহিল না। তাহারা হলুদের গুড়ার সঙ্গে চুন মিশাইয়া রং তৈরি করিয়া দিল। কচুর পাতা বাটিয়া সবুজ রং বানাইতে বসিল। আসমানী সেগুলিকে মনের মত করিয়া কাজে লাগাইল।

আর আমি কবিতা লিখিতে আরম্ভ করিলাম। প্রথমে লিখিলাম গঙ্গা ফড়িং এর কবিতা।

একটা ছোট খুকু আদর করিতে যাইয়া গঙ্গা ফড়িং-এর পাখায় ব্যথা দিয়া ফেলিয়াছে। গঙ্গাফড়িং আর উড়িতে পারে না। শস্য ক্ষেতে যাইয়া কচি ধানের পাতা কাটিয়া আনিতে পারে না। বাসায় তাহার ছোট দুইটি খোকা খুকু। তারা খাইতে চায় গঙ্গাফড়িং বলে, “কেমন করিয়া আমি উড়িব? কেমন করিয়া তোমাদের খাবার আনিয়া দিব? আমার পাখায় যে ব্যথা করিতেছে।” আমি যদি উড়িতে যাই কেউ হয়ত সুকটি ভাঙ্গিয়া আমাকে আরও ব্যথা দিবে। হয়ত পাখা ভাঙিয়াই ফেলিবে। বাচ্চারা বলে, “তবে

আমরা খাব কি?" গঙ্গাফড়িং বাচ্চাদের মুখের কাছে মুখ লাগাইয়া শুধু কাঁদে।

একদিন রাত্রে সেই খুকুটি স্বপ্নে সব জানিতে পারিল। পরদিন সে মাঠ হইতে ধানের কচি পাতা আনিয়া বাচ্চাদের খাইতে দিল। আদর করিয়া গঙ্গাফড়িংকে বলিল, "গঙ্গাফড়িং! আর আমি তোমাকে ধরিব না। তুমি এবার বাচ্চাদের জন্য খাবার আনিতে যাও।" গঙ্গা ফড়িং ফুড়ুৎ করিয়া উড়িয়া চলিল।

এই কবিতা লিখিয়া মিনারের আপার কাছে আসিয়া বলিলাম, আপা! একটা কবিতা লিখিয়াছি।' "কিসের উপর কবিতা লিখিয়াছ কবি ভাই?" হাসিয়া আপা জিজ্ঞাসা করিল।

আমি বলিলাম, "গঙ্গাফড়িং এর উপর।" আপা শুনিয়াতো হাসিয়াই অস্থির। "আচ্ছা কবি ভাই! তুমি কবিতা লেখার আর কোন বিষয় পাইলে না? একেবারে গঙ্গাফড়িং এর উপর?"

আমি বলিলাম, 'আপা! তুমি শোনই না একবার! আরশুলার উপর কবিতা লিখিয়াছিলাম, চামচিকার উপর লিখিয়াছিলাম। তা যেন তোমার ভাল লাগে নাই। কিন্তু গঙ্গাফড়িং এর উপর কবিতা তোমার নিকট নিশ্চয় ভাল লাগিবে। তুমি একবার শোন।"

ভাল না লাগিয়া আপা বেচারীর আর উপায় কি? আমার কবিতা শুনিয়া বাধ্য হইয়া সে তারিফ করিল।

আমি বলিলাম, "আপা! এবার তবে কবি বিদায় কর। কবিতা লেখার পুরস্কার দাও। আপা বড়ই ভাল লোক। আমাকে অনেকগুলি টাকা দিল। সেই টাকা আসমানীদের দিয়া আসিলাম। কিছুদিনের জন্য আসমানীদের অভাব ঘুচিল।

আসমানীদের দেশ ছাড়িয়া অনেক জায়গা ঘুরিয়া আসিলাম। কত শহরে-বন্দরে, কত গ্রামে, কত ঘরে আসমানীদের মতই হতভাগিনী মেয়েকে দেখিয়া আসিলাম। কাছে ডাকিয়া আদর করিয়া বুকে ধরিলাম। কিন্তু আমার আদরে তাহাদের ভাগ্যের কতটুকু পরিবর্তন হইবে? কে এই আসমানীদের পেট ভরিয়া খাইতে দিবে, কে তাহাদের দুঃখ কষ্টের কথা ভাষায় লিখিয়া দুনিয়ার সকল লোককে শুনাইবে? ভাবিলাম, আর কাউকে না পারি, আমি

কবিভাইর-আস্তানা

আসমানীকে মানুষ করিয়া তুলিব। তার সকল দুঃখের কথা আমার ছোট ভাই বোনদের শুনাইব।

তাই আসমানীদের দেশে আবার ফিরিয়া চলিয়াছি। পথ চলিতেছি আর মনে মনে ভাবিতেছি কি ভাবে সেখানে যাইয়া কাজ শুরু করিব। কার কার সঙ্গে প্রথম আলাপ করিব। এমন সময় দেখা হইল আমার ছোট দুইটি ভাই-এর সঙ্গে।

১১ □ আসমানীকে সাপে কাটিয়াছে

তাহারা আমাকে দেখিয়া দৌড়াইয়া আসিল। "কবি ভাই! আপনি আসিয়াছেন? জানেন আসমানীকে সাপে কাটিয়াছে ?"

"সাপে কাটিয়াছে?" আমার বুকখানা ধড়াস করিয়া উঠিল। তবে কি আসমানীকে আর ফিরিয়া পাইব না? সেই সোনার কলি মেয়ে, আর কি আমাকে কবি ভাই বলিয়া ডাকিবে না! ফোঁটা ফোঁটা পানি দুই চোখ হইতে ঝরিতে লাগিল।

ভাই দুইটি আমাকে বলিল, "কবি ভাই! আপনি শীগগির যান। আমরা ইয়াছিন ওঝাকে ডাকিতে যাইতেছি। সে আসিয়া মন্ত্র পড়িয়া আসমানীকে সারাইয়া দিবে।"

এই বলিয়া ভাই দুইটি দৌড়াইয়া চলিয়া গেল। আমি তাড়াতাড়ি আসমানীদের বাড়ির পথে চলিতে লাগিলাম।

আর মাত্র এক মাইল পথ। সেই পথ কি ফুরাতে চাহে? চলিতে চলিতে কত কথাই আজ মনে পড়িতেছে। কত দুঃখই না খোদা আসমানীদের কপালে লিখিয়াছেন। সেই যে গ্রামের পীর সাহেবের বাড়িতে ক্ষুধাতুরা আসমানীকে লাইয়া গিয়াছিলাম, তাহারা আসমানীকে খাইতে দেয় নাই। গ্রামের ব্যবসায়ী মহাজনের বাড়িতেও আসমানীর জন্য এক মুঠো ভাত জোটে নাই। এই সব কথা আরও করুণ হইয়া মনে জাগিতেছে। যত জোরে দুই পা চলে তারও চাইতে জোরে দৌড়াইতে চাহি। হায়, আসমানীকে যদি যাইয়া জ্যান্ত না পাই?

দৌড়াইতে দৌড়াইতে আসমানীদের বাড়িতে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। উঠানের উপর দুই তিন শত লোক কলরব করিতেছে। একজন লোক

আসমানীকে সামনে বসাইয়া মন্ত্র পড়িতেছে। তারই পাশে আসমানীর মা আছাড়ী পিছাড়ী করিয়া কাঁদিতেছে।

"ওরে আমার মারে! তোরে আমি একদিনও পেট ভরিয়া খাইতে দিতে পারি নাইরে।"

আসমানীর মায়ের কান্নায় আসমান ভাঙ্গিয়া পড়ে। আসমানীর গায়ের সোনার বর্ণ কালো হইয়া গিয়াছে। তাহার মুখ দিয়া গোগলা উঠিতেছে। মাঝে মাঝে জ্ঞান হইয়া অসহায় ভাবে এদিক ওদিক চাহিতেছে। আমি আসমানীর হাত টানিয়া লইয়া হাতের নাড়ী পরীক্ষা করিলাম। দেখিলাম তীরতীর করিয়া নাড়ী চলিতেছে। হয়ত আর বেশীক্ষণ সে বাঁচিবে না। আসমানীর জন্য দুই চোখ বাহিয়া পানি গড়াইয়া পড়িতে চাহিতেছিল। কিন্তু কাঁদিলে তো আসমানীকে বাঁচাইতে পারিব না। এখন মনের ধৈর্য্য হারাইলে চলিবে না। যেমন করিয়া হোক আসমানীকে বাঁচাইতে চেষ্টা করিব।

আমি তাড়াতাড়ি আসমানীর বাম হাতের যে অংশটায় সাপে কামড়াইয়া ঘা করিয়াছে, তাহা পরীক্ষা করিলাম। তারপর ঘায়ের উপর হাতের কব্জায় বন্ধন দিলাম। তারও উপরে ডানার উপর ঘাড়ের কাছে আর একটি বন্ধন দিলাম। উদ্দেশ্য এই যে, ক্ষতস্থানের বিষ যেন তাড়াতাড়ি উপরে উঠিয়া আসমানীর মগজ আক্রমণ করিতে না পারে।

এই কাজ করিয়া উঠানের সমবেত লোকগুলিকে বলিলাম, "তোমরা যেখান হইতে পার মুরগীর ছোট ছোট সাত আটটি বাচ্চা লইয়া আইস।" আমার কথা শুনিয়া উঠানের একজনও নড়িল না। তাহারা যেন মজা দেখিতে আসিয়াছে। আমি তাহাদের আবার বলিলাম, "ভাইসব দেখিতে পাইতেছ না আসমানীর দেহে আর একরত্তি প্রাণ মাত্র অবশিষ্ট আছে। যেখান হইতে পার ৭/৮টি মুরগীর বাচ্চা লইয়া আইস। মুরগীর বাচ্চা যদি আনিতে পার তাহা হইলে হয়ত আসমানীকে বাঁচাতেই পারিব।

উঠানের একধারে আমার দুইটি ছোট ভাই নীরবে দাঁড়াইয়াছিল। তাহারা আমার কথা শুনিয়া দৌড়াইয়া ছুটিল মুরগীর বাচ্চা আনিতে। বয়স্ক লোকেরা আমার কথায় কানও দিল না। এমন সময় আগের সেই ভাই দুইটি ইয়াসিন ওঝাকে লইয়া আসিল। সকলে ইয়াসিনকে দেখিয়া পথ করিয়া দিল। ইয়াসিন আসিয়াই আসমানীর সামনে মাটিতে একটি গড়গড়ি দিল। তারপর ডাক ছাড়িয়া মন্ত্র পড়িতে লাগিল।

উত্তরে পাথারে মহাদেবের কুইড়া,
তাহার বিষ রইছে পুতা জুইড়া।
কয়ড়া কড় কড় করে কন্য করে কা,
শিগগীর বিষ যা মুখে যা।
ঘা মুখে খায়া বিষ করে নিমিঝিমি,
যে মুঠে ধরলাম বিষ সে মুঠে করলাম পানি।

অনেকক্ষণ এই মন্ত্র পড়িয়া ইয়াসিন বলিল, "মেয়েকে কাল নাগিনীতে খাইয়াছে। এই মন্ত্রে কিছু হইবে না। উহাকে বীজ মন্ত্র দিয়া সারাইতে হইবে। এই কথা বলিয়া সে সমবেত লোকদের দিকে চাহিল। সকলে অতি ভক্তির সঙ্গে তাহার কথা সমর্থন করিল।"

আমি তো জানি বিষাক্ত সাপে কামড়াইলে ওঝার সাধ্য নাই মন্ত্র পড়িয়া রোগীকে সারাইতে পারে। কিন্তু আমার ভাই দুইটিত এখনও মুরগীর বাচ্চা লইয়া ফিরিয়া আসে নাই। সেইজন্য আমি ওঝাকে তার মন্ত্র পড়িয়া রোগী সারাইবার অবসর দিলাম। তাছাড়া দেশের লোকের মিথ্যা বিশ্বাসের উপর এখনই যদি প্রতিবাদ করি, তবে তাহারা আমার কার্য্যে বাধা দিবে। ইয়াসিন মন্ত্র পড়িতে লাগিল ঃ-

আইস বঙ্করাজ মেঘেতে চড়িয়া,
ঢাইলা দাও বিষভান্ড আসমান নাড়িয়া।
আইস মামা ভাগ্নে আইস সুতানলি,
আইস গোখুরা সাপ পর্বত দলি।
মেঘ থইনে আইস তোমরা মেঘের
ঠাটা হইয়া,
আসমানীর গায়ের বিষ দাও নামাইয়া।

এই মন্ত্র পড়িয়া আসমানীর গায়ে কত ফুঁক ঝাড়িতে লাগিল। কিন্তু আসমানী রৌদ্রে লাউ পাতার মত কেবলই উলিয়া যাইতে লাগিল।

এমন সময় ইয়াসিন আসমানীর হাতের দুই স্থানে আমার দেওয়া রশির বাঁধন দেখিয়া বলিল, "কর্তারা! আসমানীর বিষ নামাইব কি? ইহার হাতের দুই স্থানে রশি দিয়া বাঁধন দেওয়া আছে, এই রশির বাঁধন খুলিয়া না দিলে বিষ নামান যাইবে না।"

এই বলিয়া সে আসমানীর হাতের বন্ধন খুলিতে যাইতেছিল, আমি তাড়াতাড়ি আসিয়া বাধা দিলাম। "সাবধান ওঝা সাহেব। আসমানীর হাতের বাঁধন খুলিলে এখনই আসমানী মরিয়া যাইবে। আমি ওর হাতে বাঁধন দিয়া বিষ আটকাইয়া রাখিয়াছি।"

ওঝা আমার কথা শুনিয়া রাগিয়া উঠিল। 'বন্ধন দিয়া বিষ আটকাইয়া রাখিবার শক্তি কাহারও নাই! আপনি বাঁধন ছাড়িয়া দিন। এখনই আমি বিষ নামাইয়া দিতেছি। আমার নাম ইয়াসিন ওঝা, আমি যাকে বাঁচাইতে পারিব না স্বয়ং আল্লাহ আসিলেও তাকে বাঁচাইতে পারিবে না।" এই বলিয়া ইয়াসিন উঠানের সমস্ত লোকের দিকে তাকাইল, তাহারা নীরবে ইয়াসিনকে সমর্থন করিল। একজন বয়স্ক লোক আসিয়া আমাকে কঠোরভাবে বলিল, "সাহেব! আপনি পুলাপান লইয়া খেলা করেন তাই করেন গিয়া। এই সব হয়ুত ময়ুতের ব্যাপারে কথা কইবার আসিবেন না। ওঝাকে হাতের বন্ধন খুলিতে দিন।"

আমি খুব জোরের সঙ্গে বলিলাম, "আমি কিছুতেই বন্ধন খুলিতে দিব না। আমি বহুদেশ ঘুরিয়াছি। এই ইয়াসিন ওঝার মত বহু ওঝা দেখিয়াছি। তাহাদের মন্ত্রে কোথাও সাপে কাটা লোক সারে নাই। এই মেয়ের হাতের বন্ধন খুলিয়া দিলেই সে মরিয়া যাইবে।'

আমার কথা শুনিয়া ইয়াসিন ওঝা তাচ্ছিল্যভাবে হাসিল। সামনের লোকটি বলিল, "মিঞা সাহেব! জানেন, ইয়াসিন ওঝা সাত দিনের মরা বাঁচাইতে পারে। রসুলপুরের মতি মিঞা সাপের কামড়ে মরিয়া গেল। ইয়াসিন তখন দেশে ছিল না। সকলে মতি মিঞাকে কবর দিল। আটদিন পরে ইয়াসিন ওঝা আসিয়া সেই গোর হইতে মতি মিঞার লাশ বাহির করিয়া মন্ত্র পড়িয়া তাহাকে বাঁচাইয়া দিল। এতো আমাদের দেখা ঘটনা।"

এতবড় অকাট্য যুক্তির সঙ্গে আমি কেমন করিয়া পারি। এখানে সকলে আসিয়াছে, বিশ্বাস করিতে। যে যাহার মত গল্প বানাইয়া ইয়াসিন ওঝার মহিমা প্রচার করিতে লাগিল। সমস্ত লোকের ধারণা হইল ইয়াসিন ওঝা মেয়েটিকে বাঁচাইতে যাইতেছিল। আমি বাধা স্বরূপ তাহাকে মরণের দিকে ঠেলিয়া দিতেছি। আসমানীর মা আমার পায়ের উপর পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। 'কবি ভাই! আপনি সরিয়া যান। আমার আসমানীকে বাঁচাইতে দেন।"

আমি বলিলাম, "আমি বাঁচিয়া থাকিতে আসমানীর হাতের বন্ধন খুলিতে দিব না। তোমরা ত বল ইয়াসিন ওঝা মরা মানুষ বাঁচাইতে পারে। মরা মানুষ যে বাঁচাইতে পারে সে ডোর বাঁধা অবস্থায় রোগীকে সারাইতে পারিবে না কেন?" কিন্তু কে কার কথা শোনে। তিন চার জন বয়স্ক লোক আসিয়া আমাকে সেখান হইতে টানিয়া লইয়া যাইতে চেষ্টা করিল।" আরে সরিয়া যান সাহেব, ওঝা যা বলে তাই করিতে দেন, এতে যদি আসমানী মরে তো মরুক।"

আমি বলিলাম, "ভাইসব! তোমাদের আল্লাহ নবীর দোহাই! এই মেয়ের হাতের বন্ধন খুলিও না। আমি বহুদেশ ঘুরিয়াছি। বহু জায়গায় দেখিয়াছি এইভাবে আনাড়ী ওঝারা মন্ত্র পড়িয়া সাপে কাটা রোগীর হাতের বন্ধন খুলিয়া কত জনকে মারিয়া ফেলিয়াছে। আমি কিছুতেই আসমানীর হাতের বন্ধন খুলিতে দিব না।"

"কি আমাদের কথার উপর কথা?" এই বলিয়া সেই বয়স্ক তিন চার জন লোক আমার মুখে কিল ঘুষি দিতে লাগিল। আমার নাক মুখ দিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল। তবুও আমি আসমানীর নিকট হইতে সরিয়া গেলাম না।

আমি তাহাদের বলিলাম, "ভাইসব! তোমরা আমাকে মারিয়াছ, তাহার জন্য কোন কথা নাই; কিন্তু তোমাদের পায়ে পড়ি আমাকে একটু চেষ্টা করিতে দাও। এতক্ষণ ইয়াসিন ওঝা মন্ত্র পড়িল। রোগীর কিছুই হইল না তোমরা আমাকে একটু চেষ্টা করিয়া দেখিতে দাও।"

ইয়াসিন ওঝা বলিল, "আমি মন্ত্র পড়িয়া কেমন করিয়া রোগী সারাইব? তুমিই তো হাতের উপরে বন্ধন দিয়া আমার সারানোর পথ নষ্ট করিয়া দিয়াছ। একটি বলবান লোক আসিয়া আমাকে বলিল, "দেখেন সাহেব! আপনি এই মেয়েটির জীবন লইয়া খেলা করিতে বসিয়াছেন। এতক্ষণ আপনাকে মান্য করিয়াছি, আপনি যদি মুহূর্তে এখান হইতে সরিয়া না যান তবে ভাল হইবে না।"

তখন আমি খুব জোরের সঙ্গে বলিতে লাগিলাম, "তোমরা আমার উপর বল প্রয়োগ করিতে চাও? কিন্তু আমি সাবধান করিয়া দিতেছি, হাতের বন্ধন খুলিয়া দিলে যদি এই মেয়েটি মারা যায় তবে কাল থানা হইতে দারোগা আনিয়া তোমাদের সকলকে বাঁধিয়া লইয়া যাইব। এই কথা যেন মনে থাকে। জান ত থানার দারোগা আমাকে খাতির করে।"

এমন সময় আমার সেই ভাই দুইটি সাত আটটি ছোট ছোট মুরগীর বাচ্চা লইয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে ছুটিয়া আসিল। আমার কথায় গ্রামবাসীদের মনেও একটু ভয়ের সঞ্চার হইল। একজন আগাইয়া আসিয়া বলিল, "আচ্ছা কবি ভাইকে একটু সময় দেওয়া যাউক। দেখি উনি কি করেন।"

আমি তাড়াতাড়ি পকেট হইতে ছুরি বাহির করিয়া আসমানীর ক্ষতস্থানটিতে আরও কিছুটা ক্ষত করিলাম। টিপিয়া টিপিয়া সেই স্থান হইতে রক্ত বাহির করিয়া দিলাম। তারপর মুরগীর বাচ্চার পাছায় চাকু দিয়া ঘা করিয়া সেই স্থান আসমানীর ক্ষতস্থানে লাগাইলাম। ৩/৪মিনিটের মধ্যেই বাচ্চাটি মরিয়া গেল। তাড়াতাড়ি আর একটি বাচ্চাকে একইভাবে ক্ষত করিয়া আবার ক্ষতস্থানে লাগাইলাম। সেটিও মরিয়া গেল। এইভাবে আরও একটি আরও একটি করিয়া পাঁচটি বাচ্চা মরিয়া যাওয়ার পর ষষ্ঠ বাচ্চাটি মরিল না। ঝিমাইতে লাগিল। আসমানীর ক্ষতস্থান টিপিয়া আরও খানিকটা রক্ত বাহির করিয়া দিলাম। তারপর সেই রক্তাক্ত ক্ষতের উপর আরও একটি মুরগী লাগাইলাম। সেটি মরিল না। তখন আমি সমবেত লোকদের বলিলাম, "আসমানীর বিষ আমি বাহির করিয়া লইয়াছি। এরপর আর কোন ভয় নাই। তোমরা একটু গরম পানি আন।"

অল্পক্ষণের মধ্যেই গরম পানি আসিয়া গেল। আমি সেই ঈষৎ গরম পানি আসমানীর ঘায়ের উপর ঢালিতে লাগিলাম। তাহাতে ক্ষতস্থান হইতে আরও রক্ত বাহির হইয়া আসিল। এইবার কিছু ঠান্ডা পানি লইয়া আসমানীর চোখে মুখে ছিটাইয়া দিলাম। তাহার কানের কাছে মুখ লইয়া চিৎকার করিয়া বলিলাম, "আসমানী! তোর কিছু হয় নাই। বিষ নামিয়া গিয়াছে। তুই বাঁচিয়া গিয়াছিস।" আসমানীর জ্ঞান ফিরিয়া আসিল। সে চোখ মেলিয়া চাহিল।

এইবার আমি ইয়াসিন ওঝাকে বলিলাম, "ইয়াসিন! এখন তুমি হাতের বন্ধন খুলিয়া দিতে পার।" ইয়াসিন আরও দুই তিনটি মন্ত্র পড়িয়া বন্ধন খুলিয়া দিল। আমি যে ইয়াসীনকে বন্ধন খুলিয়া দিতে অনুমতি দিয়া তার মান রাখিয়াছি সেইজন্য সে আমার উপর খুব খুশী হইল। সে আমাকে ধরিয়া পড়িল, "কবি ভাই। কিভাবে আপনি বিষ নামাইলেন, সেই মন্ত্রটা আমাকে শিখাইয়া দিন।"

আমি বলিলাম, "ইয়াসিন! আমি তো কোন মন্ত্র বিশ্বাস করি না। তবে কিভাবে আসমানীকে সারাইলাম তাহা যদি জানিতে চাও বলিতে পারি।"
গ্রামের সকল লোক আমাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। তাহারা সকলেই শুনিবে।
আমি বলিতে আরম্ভ করিলাম। "ভাইসব। তোমরা খুব খেয়াল করিয়া শুনিও। তোমরা শুনিয়াছ, মানুষকে সাপে কামড়ায়। তার মধ্যে একশত লোকের মধ্যে ৫০ জনকে সাপে কামড়ায়ই না। তাহারা হয়ত সাপ দেখিয়া দৌড় দিয়াছে কিম্বা পায়ে সাপ জড়াইয়া ধরিয়াছে, পায়ের ঝটকা দিয়া সাপকে ছাড়াইয়া দৌড় দিয়াছে, বনের লতাপাতায় পায়ের কোন স্থান কাটিয়া গিয়াছে। তারা ভয়ে ভয়ে মনে করে তাদেরকে সাপে কামড়াইয়াছে। এই সব লোককে যে কোন ওঝা যে কোন মন্ত্র পড়িয়া সারাইতে পারে। মন্ত্র না পড়িয়া কোন প্রকারের চিকিৎসা না করাইলেও তাহারা সারিয়া ওঠে। কারণ তাহাদের সাপে কামড়ায় নাই। ওঝা আসিয়া মন্ত্র পড়িয়া যখন এই সব লোককে সারাইয়া যায় তখন লোকে মনে করে, এই সব লোককে ওঝা সারাইয়াছে।"

একটি লোক বলিয়া উঠিল, "বুঝিলাম কবি ভাই।"

"ঝড়ে বগিলা মরে,
ফকিরের কেরামতী বাড়ে।"

আমি বলিলাম, ঠিকই বলিয়াছ ভাই। এই বিষয়ে আমি একটি গল্প বলিতে পারি, যদি তোমরা শুনিতে চাও।" সমবেত লোকেরা বলিল, নিশ্চয়ই শুনিব কবি ভাই। আপনি বলেন।"
আমি গল্প আরম্ভ করিলাম। তোমরা তো জান ভাই, নানা দেশে আমি ঘুরিয়া বেড়াই। ফরিদপুর জেলার চরভদ্রাসন নামে একটি গ্রাম আছে। এই গ্রামে আমি আসিয়াছি গ্রাম্য গান শুনিবার জন্য। গ্রামটি বড় সুন্দর। খেজুর গাছের উপর শালিক পাখি নাচিয়া নাচিয়া গান গাহিতেছে। গাছের ডালে, "বউ কথা কও" পাখির সুরে আকাশ ভরপুর। আপন মনে আমি ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। এমন সময় আমি খবর পাইলাম, বামুন বাড়িতে একটি মেয়েকে সাপে কামড়াইয়াছে। খবর পাইয়া আমি দৌড়াইয়া আসিলাম। কাঁচা সোনার বর্ণ ছোট্ট লাল টুকটুকে মেয়েটি। তাকে সাপে কামড়াইয়াছে। মুখ দিয়া গোগলা উঠিতেছে। গ্রামের লোকেরা হতভম্ব হইয়া উঠানে দাঁড়াইয়া আছে।

মেয়েটির মা আছাড়ি পিছাড়ি করিয়া কাঁদিতেছে। আমি যাইয়া প্রথমে মেয়েটির নাড়ী দেখিলাম।

হাতের কজিতে আঙ্গুল রাখিয়া দেখিলেই বুঝিবে, একটি নাড়ী টিন টিন করিয়া নড়িতেছে। সেই নাড়ী যদি আস্তে আস্তে চলে বা বন্ধ হইয়া যায়, তবে বুঝিবে রোগীর অবস্থা খারাপ। আমি কিন্তু নাড়ী দেখিয়া বুঝিলাম; মেয়েটির নাড়ী স্বাভাবিকভাবেই চলিতেছে।

তখন তাহার ক্ষতস্থান পরীক্ষা করিতে লাগিলাম। সাপে যদি কামুড় দেয়, তবে রোগীর ক্ষতস্থানে সাপের দাঁতের দাগ থাকে কিন্তু মেয়েটির ক্ষতস্থানে কোন দাঁতের দাগ দেখিতে পাইলাম না। তখন নিজের এই আন্দাজকে আরও ভাল মত যাচাই করিবার উদ্দেশ্যে উঠানের সমবেত লোকদের দিকে চাহিয়া দেখিলাম।তাহাদের মধ্যে একজন অল্প শিক্ষিত লোককে দেখিলাম। আমি তাহাকে নিকটে ডাকিয়া আনিয়া আস্তে আস্তে বলিলাম, "দেখুন তো মেয়েটির ক্ষতস্থানে আমি ত কোন দাঁতের দাগ দেখিতে পাই না। আমার মনে হয়- -সাপ দেখিয়া সে হয়ত দৌড় দিয়াছিল, কোন লতাপাতার বা অন্য কিছুর আঘাতে তাহার এই স্থানটিতে আঁচড় লাগিয়াছে। আপনি কি বলেন ?" লোকটি আঁচড়ের দাগটি পরীক্ষা করিয়া বলিল, আমারও সেই ধারণা।" মেয়েটির মা তখনও আছাড়ি পিছাড়ি করিয়া কাঁদিতেছিল।

আমি তাহাকে বলিলাম, "মা! তোমার মেয়েকে সাপে কামড়ায় নাই। সে এখনই ভাল হইয়া যাইবে। শীগগির ঠান্ডা পানি আন।"

সঙ্গে সঙ্গে ঠান্ডা পানি আসিল। আমি মেয়েটির চোখে মুখে পানির ছিটা দিলাম। তার কানের কাছে মুখ লইয়া বলিলাম, "তোকে সাপে কামড়ায় নাই। তুই ভাল আছিস্।" মেয়েটি জ্ঞান ফিরিয়া চাহিল। এমন সময় গ্রামের বড় ওঝা মানিক মিঞা আসিয়া উপস্থিত হইল। সে সমস্ত দেখিয়া বলিল, "কামুড় দেয় নাই বটে কিন্তু সাপে একটা চাটা দিয়াছে। যাক আমি মন্ত্র পড়িয়া দিলেই সারিয়া যাইবে।"

রোগীকে সারাইলাম আমি। গ্রামের লোকেরা কিন্তু মানিক মিঞা ওঝারই জয়গান করিতে লাগিল।

এমন সময় আমার একটি ভাই বলিল, "কবি ভাই! আপনি তো বলিলেন, মেয়েটিকে সাপে কামড়ায় নাই, তবে সে অজ্ঞান হইল কেন?"

আমি উত্তর করিলাম, "শোন তবে। সাপ দেখিয়া মেয়েটি তো দৌড় দেয়। তাতে সে খুব ভয় পায়। তারপর তার মা, খালা, বোন সকলে মিলিয়া যখন কান্না জুড়িয়া দিল, তখন মেয়েটি ভয়ে অজ্ঞান হইয়া পড়ে। আমি যদি সময় মত না যাইতাম তবে হয়ত, মেয়েটি অজ্ঞান অবস্থায়ই মরিয়া যাইত।

এই ধরনের রোগীদের জন্য গ্রাম্য ওঝারা বড়ই উপকারী। তাদের মন্ত্রে অবশ্য কিছুই হয় না। কিন্তু তাহারা যে সাহস দেয় তাহাতেই রোগী সারিয়া ওঠে। তোমরা জান না। বহু সাপে কাঁটা রোগী বুকে তালা লাগিয়া মারা যায়। ভয়ে তাদের বুকের কাজ বন্ধ হইয়া যায়। এই সব রোগীর জন্য গ্রাম্য ওঝারা বড়ই উপকারী।

আমার কথা শেষ না হইতেই গ্রামের একটি লোক বলিয়া উঠিল, "আচ্ছা কবি ভাই! এই ত গেল শতকরা পঞ্চাশ জন; তাদের সাপে কামড়ায়ই না কিন্তু বাকী যে পঞ্চাশ জনকে সাপে কামড়ায় তাদের ব্যবস্থা কি?"

আমি বলিলাম, "দাঁড়াও আসমানীকে কিছু গরম দুধ খাওয়াতে হইবে। তাহার শরীর এখনও খুব দুর্বল। পকেট হইতে পয়সা বাহির করিয়া আমার একটি ছোট ভাইকে পাঠাইয়া দিলাম আসমানীর জন্য কিছু দুধ আনিতে। তারপর আরম্ভ করিলাম।

বাকী ত রইল পঞ্চাশ জন। এই পঞ্চাশ জনের পঁচিশ জনকে এমন সাপে কামড়ায় যাদের কামড়ে কোন বিষ নাই। এই পঁচিশ জনও তাই ওঝার ঝাড় ফুঁকে অনায়াসে সারিয়া যায়। আমেরিকায় দেখিয়া আসিয়াছি, "ছোটদের স্কুলে-এই ধরনের যে সব সাপের বিষ নাই তাহাদের আয়নার বাক্সে রাখিয়া পোষা হয়। ছোটরা এই সব সাপকে চিনিয়া রাখিতে পারে।"

'তবে আর পঁচিশ জনের কি হইবে কবিভাই?" একটি ছোট ভাই আমাকে প্রশ্ন করিল। আমি বলিলাম, 'বাকী পঁচিশ জনকে সত্যই বিষাক্ত সাপে কামড়ায়, যেমন গোখুরা, জলবোড়া, কাল কেউটে ইত্যাদি। এদের মধ্যে সাড়ে বার জনকে সাপে কামড়াইলেও সম্পূর্ণভাবে সেই ক্ষতস্থানে বিষ ঢালিতে পারে না। যতটুকু বিষ ঢালে ততটুকু বিষ তারা সহজেই হজম করিতে পারে। এই সাড়ে বার জনকেও ওঝা আসিয়া মন্ত্র পড়িয়া সারাইতে পারে। কারণ কেহ মন্ত্র না পড়িলেও তাহারা সারিয়া উঠিত।

আর যে বাকী সাড়ে বার জন থাকে তাহাদের কোন ওঝাই বাঁচাইতে পারে না। তোমরা গ্রামবাসীরা যে সচরাচর দেখিতে পাও ওঝা আসিয়া সাপে কাঁটা

রোগী সারায় সে এই শতকরা সাড়ে বারো জন রোগীকে সারাইতে পারে বাকী সাড়ে বার জন রোগীর জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত করিতে হইবে। ওঝা তাহাদের কিছুই করিতে পারিবে না।

এমন সময় আমার সেই ভাইটি গরম দুধ লইয়া আসিল। আমি আসমানীকে খাইতে দিলাম। ইয়াসীন ওঝা আগাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কবি ভাই! বলেন, শতকরা বাকী যে সাড়ে বার জন তাহাদের কি করিয়া বাঁচান যায়?"

আমি বলিলাম, "সাপে যদি কাউকে কখনও কামড়ায় তৎক্ষণাৎ সেই ক্ষত স্থানের উপরে ভালমত বন্ধন দিবে। যদি হাতে কামড়ায় তবে হাতের কব্জিতে একটা বন্ধন দিবে। ডানার উপরে আর একটি বন্ধন দিবে। আর যদি পায় কামড়ায় তবে পায়ের নলায় ক্ষতস্থানের উপর বন্ধন দিবে আর থোড়ার উপরে আর একটি বন্ধন দিবে।' "দুইটি বন্ধন কেন দিবে কবি ভাই?" একটি ছেলে আমাকে জিজ্ঞাসা করিল।

আমি বলিলাম, "প্রথম বন্ধনটা যদি ঠিকমত না হইয়া থাকে সেই জন্য আর একটি বন্ধন দেওয়া প্রয়োজন। তোমরা ত জান, আমাদের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে সমস্ত শরীরে রক্ত চলাচল করিতেছে। কতকগুলো নাড়ী দিয়া রক্ত উপরের দিকে ওঠে। এই নাড়ীগুলি থাকে উপরের দিকে। তার তলে আর এক রকমের নাড়ি থাকে সে গুলি দিয়া রক্ত উপর হইতে নীচের দিকে নামে। শরীরের কতকগুলি নাড়ী দিয়া রক্ত শরীরের কোন স্থানে বিষাক্ত সাপে কামড়াইল-ক্ষত স্থানে সাপের বিষ ঢুকিয়া সেই স্থানের রক্তকে বিষাক্ত করিয়া তোলে। বিষাক্ত রক্তের ধর্মই হইতেছে, শরীরে অন্যান্য যে সকল স্থানে বিশুদ্ধ রক্ত আছে সেই স্থানে ধাওয়া করা। সেই জন্যে সাপে কাটা রোগীর ক্ষতস্থানের উপরে দুই জায়গায় দুইটি বন্ধন দেওয়ার প্রয়োজন। ইহাতে সেই স্থানের বিষাক্ত রক্ত শরীরের অন্যান্য স্থানে চলাচল করিতে পারে না। কিন্তু বন্ধন দুইটি খুব আঁটিয়া দিলে ক্ষতস্থানের ভিতরে যেসব নাড়ি দিয়া উপরের রক্ত নীচে নামে তাহার চলাচল বন্ধ হইয়া যায়। ইহাতে রোগীর খুব কষ্ট হয়।

সেই জন্য বন্ধন দুইটি কিছু ঢিলা রাখিতে হয়। কতটা ঢিলা রাখিতে হইবে তাহার পরিমাণ জানিতে বন্ধন দিবার আগে শরীরের যে স্থানে বন্ধন দিবে সেই স্থানে সরু সরু দুই তিনটি কাঠি রাখিয়া খুব আঁটিয়া বন্ধন দিবে। তাহার পর কাঠি তিনটি টানিয়া খুলিয়া লইবে। ইহাতে বন্ধন অপেক্ষাকৃত

ঢিলা হইবে। শরীরের ভিতরের যে সকল নাড়ী দিয়া রক্ত নীচে নামে তাহা সহজে চলাচল করিবে। তবে কতটুকু সরু কাঠি লাগাইবে, আর বন্ধন কতটুকু ঢিলা হইবে ইহা নিরুপণ করা সাধারণ লোকের পক্ষে কঠিন। এই জন্য অনেকেই বন্ধন আঁটিয়ে দেয়।

আর একটা কথা মনে রাখিবে। অধিকাংশ সাপের বিষ খুব আস্তে আস্তে চলাচল করে। তবে কোন কোন সাপের বিষ খুব তাড়াতাড়ি চলাচল করে। তাহাদের সংখ্যা খুবই কম।

আমার একটি ভাই বলিল, "শুনিলাম আমাদের পাশের গ্রামের আরমানকে সাপে কাটা মাত্রই মরিয়া গেল।"

আমি উত্তর করিলাম, "হয়ত তাহাকে যে সাপে কামড়াইয়াছিল তাহার বিষ দ্রুত চলাচল করে অথবা তাহাকে সাপে কাটিলে আত্মীয়-স্বজনেরা তাহাকে ঘিরিয়া কান্নাকাটি আরম্ভ করে। ভয়েই লোকটির বুকের যন্ত্র বন্ধ হইয়া মারা যায়।

খোদা না করুন, তোমাদের কাউকে যদি সাপে কামড়ায়, তবে মনে খুব সাহস রাখিবে। ভালমত চিকিৎসা করিতে পারিলে সাপে কাটা মরে না। দেশে এক রকমের ওঝা আছে। তাহারা সাপে কাটা রোগীর ক্ষতস্থানে মুখ লাগাইয়া বিষ চুষিয়া বাহির করিয়া ফেলায়। এই ধরনের ওঝারা সাপে কাটা রোগীকে সত্য সত্যই সারাইয়া তোলে। কিন্তু ওঝার মুখে যদি কোন ঘা বা ক্ষত থাকে তবে এই রূপ চিকিৎসায় তাহার ক্ষতস্থানে বিষ প্রবেশ করিলে সে নিজেই মারা যায়। বড় বড় হাসপাতালে এক রকমের যন্ত্র আছে, তাহার সাহায্যেও ক্ষতস্থান হইতে বিষ পাম্প করিয়া বাহির করিয়া আনা যায়।

"তাহা ছাড়া বড় বড় হাসপাতালে এক রকমের ইনজেকশন আছে। তাহা প্রয়োগ করিলেও সাপে কাটা রোগী ভাল হয়। আমার কথামত চিকিৎসা করিয়া রোগীকে কোন ভাল ডাক্তার দেখাইয়া পরামর্শ লওয়াও উচিত।"

"নিকটে কোন ভাল হাসপাতাল থাকিলে সেখানেও রোগীকে লইয়া যাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু সাবধান! আমার উপদেশমত আগে সব কিছু করিয়াই তবে ডাক্তার বা হাসপাতালের সাহায্য লইতে যাইবে।

আরও একটি পরামর্শ তোমাদের দিতে পারি। সাপে কাঁটা মাত্র চিমটা দিয়া একখানা দগদগে আগুন সেই ক্ষতস্থানে ঠাসিয়া ধরিবে। ইহাতে রোগী হয়ত খুব চিৎকার করিবে। কিন্তু এই আগুনে বিষ নষ্ট হইয়া যাইবে।

রোগী মৃত্যুর হাত হইতে বাঁচিবে। পটাসিয়াম পারমেঙ্গানেট পানিতে ঘন করিয়া গোলাইয়া সাপে কাঁটামাত্র ক্ষতস্থানে দিলেও রোগী ভাল হয়। এজন্য প্রত্যেক বাড়িতে কিন্তু ঔষধ রাখা উচিত।

ইয়াসীন আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা আপনি মুরগীর বাচ্চা আনিয়া রোগীর ক্ষতস্থানে ধরিলেন কেন?"

আমি উত্তর করিলাম, "সেই কথাই তোমাদিগকে বলিব। আগেই তো বলিয়াছি বিষাক্ত রক্তের ধর্মই হইতেছে পরিষ্কার রক্তের মধ্যে ধাওয়া করা। তোমরা তো দেখিলে বাচ্চা মুরগীর পাছার দিকে ক্ষত করিয়া আমি সেই স্থানটি আসমানীর ক্ষতস্থানে লাগাইলাম। তাহাতে আসমানীর পা হইতে বিষাক্ত রক্তের ধারা মুরগীর শরীরে প্রবেশ করিল। মুরগীটি মারা গেল। এইভাবে শেষ মুরগীটি যখন মরিল না তখন আমি বুঝিতে পারিলাম আসমানীর ক্ষতস্থানে আর বিষ নাই।

তবু আসমানীর ক্ষতস্থানটি টিপিয়া সেখানে হইতে আরও রক্ত বাহির করিয়া দিলাম। যদি বা সামান্য একটুও বিষ সেখানে থাকে তাহা বাহির হইয়া গেল।"

ইয়াসীন আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা, কবি ভাই! যদি প্রথম মুরগীটিই না মরিত তবে আপনি কি করতেন?"

আমি বলিলাম, "তাহা হইলে বুঝিতাম আসমানীকে কোন বিষাক্ত সাপে কামড়ায় নাই। সুতরাং তাহার কোনই চিকিৎসা করার প্রয়োজন হইত না।"

আমি এইভাবে কথা বলিতেছি, এমন সময় যে দুইটি লোক আমার নাকে মুখে ঘুষি মারিয়াছিল, তাহারা জোড় হাত করিয়া আমার সামনে আসিয়া দাঁড়াইল।

"কবি ভাই আমাদের মাফ করেন।"

আমি বলিলাম, মাফ করার ত কিছুই নাই। তোমরাও আসমানীর ভাল চাহিয়াছিলে। হাজার বৎসরের অশিক্ষায় নানা রকমের কুসংস্কারে তোমরা অন্ধ হইয়া আছ। তোমাদের যে লেখাপড়া শিখাইয়া এইসব কুসংস্কার হইতে মুক্ত করিতে পারি নাই ইহা আমাদেরই দোষ। সরল মনে তোমরা বুঝিয়াছিলে, ইয়াসীন ওঝার মন্ত্রে আসমানী সারিয়া উঠিবে। কিন্তু এখন কি মনে হইতেছে ?"

তাহারা বলিল, "এখন ত ভালমত বুঝিলাম আপনি না থাকিলে আসমানী বাঁচিত না। যদি কোথাও কাউকে সাপে কাটে তবে আপনার উপদেশ মত তাহাকে সারাইতে চেষ্টা করিব।"

আমি বলিলাম, "শোন ভাই! আরও একটি কথা। সাপে কামড়ান রোগীর ক্ষতস্থানে আমার পূর্ব উপদেশ অনুসারে বন্ধন দিয়া তাকে নিকটস্থ কোন ভাল হাসপাতালে লইয়া যাইতে চেষ্টা করিবে। ঢাকা কলিকাতা প্রভৃতি বড় বড় হাসপাতালে সাপে কাটা রোগীর আরও অনেক উন্নত ধরনের চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে।"

কথায় কথায় বেলা শেষ হইয়া আসিয়াছিল আমি গাঁয়ের লোকদের কাছে বিদায় লইয়া আমার সেই ছোট্ট ঘরখানার দিকে-রওয়ানা হইলাম।

১৩ ☐ আমাদের সমাজ

চারিদিকে অন্ধকার করিয়া রাত আসিল। আমি আমার ছোট্ট ঘরখানায় বসিয়া আছি। চারিধারের বনে সেই অন্ধকার যেন আরও জমাট বাঁধিয়াছে। তাহারই উপর দিয়া ছোট ছোট জোনাকিগুলি আলোর নক্সা বুনোট করিয়া চলিয়াছে। বসিয়া বসিয়া বহু কথাই মনে জাগিতেছিল।

এমনই অন্ধকারময় আমার সমাজ। কত রকমের মিথ্যা কুসংস্কারে আবদ্ধ হইয়া আছে। আমার ছোট ছোট ভাইবোনগুলিকে লইয়া জোনাকী মতির মত সেই অন্ধকারের উপর আলোর নক্সা বুনাইতে কবে আমি পারিব ?

বয়স্ক লোকেরা আমাকে আমল দেয় না তারা বলে, কবি ভাই! তুমি কি করিবে, তোমার এই সবকথা ছোটদেরকে শুনাইয়া? সমাজে তো তাদের কোনই শক্তি নাই। ছোটরা তোমার কথা বুঝিলেই বা কার কি আসে যায়? সমাজ তো চালায় বড়রা।" আমিও তাই ভাবি। কি হইবে এই সব দুঃখ কষ্টের কথা আমার সোনামনি ভাইবোনদের বলিয়া। ঘরে ঘরে কত হাসি খুশী মুখ। ছাড়ার নুপুর বাজাইয়া আঙিনা মুখর করিয়া তোলে। কি হইবে তাদের কাছে আসমানীর কথা বলিয়া? ভন্ড পীর সাহেবের কাহিনী বলিয়া ওদের মন কেন খারাপ করি?

কিন্তু সত্যই কি এতে কোনই লাভ হইবে না? আমার এই ছোট ছোট একরত্তি ভাই বোনগুলি কি অল্প দিনেই বড় হইয়া উঠিবে না? গ্রামের মিথ্যা পীর সাহেব কি তখনও ওদের ঠকাইতে আসিবে?

ওরা বড় হইলে এমনই করিয়া ইয়াসীনের মত শত শত মুর্খ ওঝা কি সাপে কাটা রোগীর হাতের বন্ধন খুলিয়া দিয়া-গাঁয়ে গাঁয়ে শত শত লোক মারিয়া ফেলিবে?

তবে কেন ওদের কাছে এসব বলিব না? শুধু সুখ সত্যকার সুখ নয়, যারা দুঃখ পায় তাদের কথাও জানুক আমার সোনার কলি ভাই বোনেরা।

এই দেশের যা কিছু গৌরব করার আছে, তাও ওদের জানাইয়া দিব। এই দেশে কোথায় কোন ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা লুকাইয়া আছে ওদের কানে কানে বলিয়া দিব। সেই সঙ্গে এই দেশের গৌরবের কথাও ওদের বলিব। এর যেখানে অন্যায়, যেখানে অবিচার, অন্ধ কুসংস্কার তার বিরুদ্ধেও ওদের সজাগ করিয়া দিয়া যাইব। তারপর ওরা যখন বড় হইবে, তখন হয়ত আমি বাঁচিয়া থাকিব না। কিন্তু, আমার হইয়া ওরা এইসব কুসংস্কার অন্যায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবে। ওদের হাতে যখন এই দেশের শাসনভার আসিবে তখন ওরা সকল মিথ্যার অবসান করিয়া দিবে।

১৪। বেদের নৌকায়

মনে মনে এই সকল ভাবিতেছি এমন সময় বাহিরে আসিয়া কে আমাকে ডাকিল, "কবিভাই! আপনি আছেন?"

"কে ইয়াসীন নাকি?" তাড়াতাড়ি আসিয়া ইয়াসীনকে ঘরে ডাকিয়া লইলাম। "বইস ইয়াসীন। কি মনে করিয়া আসিলে?"

ইয়াসীন বলিল, কবি ভাই! আজ দুপুরে আপনার সঙ্গে ভালমত কথা বলিতে পারি নাই। আপনাকে আমার বাড়ি যাইতে হইবে। আপনার আসমানীকেও সঙ্গে লইয়া যাইবেন।"

আমি বলিলাম, "আজ না গেলে হয় না ইয়াসীন ?"

ইয়াসীন বলিল, "না কবি ভাই! আজই আপনাকে যাইতে হইবে। আমাদের বাড়িতে পিঠা তৈরি হইয়াছে। আপনি আর আসমানীর দাওয়াত।"

ইয়াসীনের দাওয়াত রাখিবার জন্য আসমানীকে তার বাড়ি হইতে সঙ্গে লইয়া আসিলাম। আজ আসমানী পেট ভরিয়া পিঠা খাইতে পাইবে। আমার মনে বড়ই আনন্দ।

আঁকা বাঁকা পথ বাহিয়া অনেক বন জঙ্গল মাঠ পার হইয়া নদীর ধারে আসিলাম। সেখানে অনেকগুলি ডিঙি নৌকা বাঁধা। সেইসব নৌকায় ছেলে মেয়ে বউ লইয়া ইয়াসীনেরা আট দশটি পরিবার থাকে।

গ্রামের লোকেরা তাহাদিগকে বেদে বা বাইদ্যা বলিয়া ডাকে। তাহারা পুরুষ মেয়ে সকলে মিলিয়া কাজ করে। পুরুষেরা গর্ত হইতে বিষাক্ত সাপ ধরিয়া তাহার দাঁত ভাঙিয়া দেয়। মেয়েরা সেইসব সাপ লইয়া গ্রামে গ্রামে গান গাহিয়া সাপের খেলা দেখাইয়া পয়সা উপার্জন করে। পুরুষ লোকেরা পাখি শিকার করিয়া মাছ মারিয়া অবসর বিনোদন করে। আর সাপ ধরিয়া বাক্সে পুরিয়া ঢাকায় চালান দেয়।

এইসব সাপের বিষ বাহির করিয়া বড়বড় ডাক্তারেরা নানা রকম রোগের ঔষধ তৈয়ার করে।

ইয়াসীন আমাকে আর আসমানীকে লইয়া গিয়া অতি সমাদরে তাহার নৌকার ভিতর বসাইল। নৌকার অর্ধেকখানিতে ছই। সেই ছই-এর তলায় কেরাসীনের বাতি জ্বালাইয়া ইয়াসীনের বউ পিঠা ভাজিতেছিল।

পাশে তাহার সুন্দর মেয়েটি আসমানীরই সমান বয়স। সে বার বার হাসি খুশী মুখে আসমানীর দিকে চাহিতেছিল।

আমি বলিলাম, "ইয়াসীন, এটি বুঝি তোমার মেয়ে ? বল তো সোনা! তোমার নাম কি?"

মেয়েটি বলিল, "আমার নাম বাতাসী।" বলার মধ্যে কোনই জড়তা নাই।

আমি আসমানীকে বলিলাম," আসমানী! যাও বাতাসীর সঙ্গে কথা বল।"

আসমানী আরও আমার কাছে ঘেঁষিয়া বসিল। লজ্জায় সে তার ময়লা আঁচলখানি দিয়া মুখ ঢাকিবার জন্য বৃথা চেষ্টা করিতেছিল।

আমি ইয়াসীনের সঙ্গে কথা জুড়িয়া দিলাম। ইয়াসীন এখানকার বেদে দলের মোড়ল। নৌকায়ই তাহারা বাস করে। কোথাও কোনদিন ডাঙায় মাটিতে ঘর বাঁধে না। সাপ ধরিতে সে বাংলাদেশের নানা জেলায় ঘুরিয়া বেড়ায়। বর্ষাকালে সাপ ধরার কাজ থাকে না। সেই সময় তাহারা সাপ লইয়া গ্রামে গ্রামে খেলা দেখাইয়া পয়সা উপার্জন করে আর মাছ ধরিয়া বাজারে বিক্রী করে। ইয়াসীন আমাকে বলিল, "কবি ভাই! আপনাকে একটা গোপন কথা বলিব। আজ যে আপনি বলিলেন, আপনি মন্ত্রতন্ত্রে বিশ্বাস করেন না, আপনার মতন আমিও মন্ত্রতন্ত্রে বিশ্বাস করি না।"

তবে কেমন করিয়া তোমরা গর্ত হইতে বিষাক্ত সাপ ধর?

ইয়াসীন বলিল, "সেই কথাই ত আপনাকে বলিবার জন্য এই দুপুর বেলা আপনাকে এখানে ডাকিয়া আনিয়াছি।

ছোট কাল হইতেই আমরা দাঁত ভাঙা সাপ লইয়া খেলা করিতে অভ্যস্ত। অনবরত সাপ লইয়া খেলা করিতে করিতে আমরা সাপের সমস্ত রীতিনীতি শিখিয়া ফেলি। সাপের মাথাটি যদি ভালমত ধরিয়া ফেলা যায় তবে আর সাপ কামড়াইতে পারে না। দাঁত ভাঙা সাপ নাড়া-চাড়া করিয়া শিশু বয়স হইতেই আমরা হঠাৎ করিয়া সাপের মাথা ধরিয়া ফেলিতে শিক্ষা করি। এই যে আমার মেয়ে বাতাসী, মাত্র ১০/১১ বৎসর বয়স হইয়াছে। 'ও' ও বিষাক্ত সাপ লইয়া খেলা করিতে পারে।

১৫ ☐ সাপ খেলান

"আয় ত বাতাসী, কবি ভাইকে একটু সাপের খেলা দেখাইয়া দে।"

বাতাসী একটু হাসিয়া নৌকার খোলের তলা হইতে একটি মাটির পাতিল বাহির করিল। হাড়ির ভিতর হইতে সাপের সোঁ সোঁ শব্দ আসিতেছিল।

ইয়াসীন বলিল, "এটি খরা গুক্ষু। কাল কদমতলী হইতে ধরিয়া আনিয়াছি। এক গৃহস্থের ঘরের মধ্যে ইঁদুরের গর্তে লুকাইয়াছিল। এখনো দাঁত ভাঙা হয় নাই।"

দাঁত ভাঙা হয় নাই। বল কি ইয়াসীন! না! না! এ সাপ লইয়া খেলা দেখাইবার দরকার নাই।"

আমার ভয় দেখিয়া বাতাসি খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

"ভয় পাইয়াছেন নাকি কবি ভাই?"

ভয়? ভয়ের কথা নয়। আমার নিকট হইতে মাত্র দুই হাত দূরে বাতাসী সাপের পাতিল লইয়া বসিয়া আছে।

ঢাকনি খুলিয়া দিলে এখনই হয়ত আমাকে আসিয়া ছোবল মারিবে।

আমি ইয়াসীনকে বলিলাম, "মানা কর ইয়াসীন, মানা কর মেয়েকে, সাপের ঢাকনি খুলিতে।" বাতাসী হাসিয়া আস্তে আস্তে পাতিলের ঢাকনি খুলিয়া দিল। সাপটি ফণা মেলিয়া পাতিলের এদিকে ওদিকে ছোবল মারিতে লাগিল। নিপুণ হস্তে বাতাসী সাপটির ফণা ধরিয়া ফেলিল। তারপর আবার নিপুণ হস্তে তাহাকে ছাড়িয়া দিল।

সাপটি হাড়ির ভিতর হইতে আরও জোরে গর্জন করিতে লাগিল। ভয়ে আমার তো শরীরের রক্ত জমিয়া বরফ হইতেছিল। আসমানী আমাকে জড়াইয়া ধরিল। সে ভয়ে কাঁপিতেছিল।

কিন্তু সেদিকে কে খেয়াল করে?

বাতাসী নিজের হাতখানা মুঠি ধরিয়া সাপের দিকে ঘুরাইতেছিল। ক্রুদ্ধ সাপ যেমনি তার হাতের উপর ছোবল মারিতে চেষ্টা করিতেছিল অতি কৌশলে সে হাতখানি সরাইয়া লইতেছিল। বাতাসীর মা যে উনানের সামনে বসিয়া পিঠা ভাজিতেছিল, সে একবারও এদিকপানে ফিরিয়া চাহিল না। এতো তাদের নিত্ত নৈমিত্তিক ঘটনা।

বাতাসীকে যে সাপে কাটিতে পারে এমন আশঙ্কার লেশও তার মুখে নাই। বাতাসীর হস্ত কৌশলের উপর তাদের এমনই বিশ্বাস।

এরপর হাড়ির ঢাকনী বন্ধ করিয়া বাতাসী নৌকার পাটাতনের তল হইতে আর দুই তিনটি সাপের ঝাঁপি টানিয়া বাহির করিল।

বাতাসীর বাবা বলিল, "ভয় পাইবেন না কবিভাই! এই সাপগুলির বিষদাঁত ভাঙা হইয়াছে। ইহারা ছোবল মারিলেও কিছু হইবে না।"

বাতাসী আস্তে আস্তে ঝাঁপিগুলির ডালা খুলিয়া দিল। হলুদ, নীল নানা বর্ণের সাপগুলির পট ফনা মেলিয়া সোঁসাঁইয়া উঠিল। তাহাদের সামনে রাখিয়া বাতাসী অতি করুণ সুরে বেহুলা লখিন্দরের বারমাসী গান আরম্ভ করিল।

কলার মান্দাসের উপর মরা পতিকে শোয়াইয়া বেহুলা-নদীর জলে ভাসিয়া চলিয়াছে। নদীর তীরে দাঁড়াইয়া তার সাত ভাই বেহুলাকে ঘরে ফিরিয়া যাইতে ডাকিতেছে। বেহুলা ফিরিয়া যাইবে না। তার সিঁথির সিন্দুর মুছিয়া সে বিধবার বেশ পরিবে না।

ভাইরা বলিতেছে, "বেহুলা সিন্দুরের পরিবর্তে তোমার কপালে ফাগের রঙ পরাইব। সাত ভাই এর সাত বউ তোমাকে গান গাহিয়া ঘুম পাড়াইবে।'

কিন্তু বেহুলা ফিরিল না। সে শংকিনি নদীর জলে ভাসিয়া চলিল। চেরেঙ্গা গোদার ঘাট ছাড়াইয়া কত দুঃখের নদী সাঁতার কাটিয়া বেহুলা নিতাই ধুপুনীর ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইল।

বাতাসীর তরুণ গলার গানে চারিধারের সমস্ত আকাশ বাতাস যেন করুণ হইয়া আসিতেছিল।

গানের সুরে সুরে সাপের ভয় ভুলিয়া গেলাম-বেদের নাও ভুলিয়া গেলাম।

মনের চক্ষে দেখিতে পাইলাম, বাতাসীরই মতন যেন এই দেশেরই একটি মেয়ে তার মরা স্বামীকে বাঁচাইবার জন্য সুদূর কোন গাঙুর নদীতে ভাসিয়া চলিয়াছে।

গানের মাঝখানে বাতাসীর মা আসিয়া হাসিমুখে বলিল, "বাতাসী, খালি যে গান গাইয়াই চলিয়াছিস! তোর কবি ভাইকে খাইতে দিবি না?"

বাতাসী যেন লজ্জিত হইয়াই গান থামাইল। আমার আর আসমানীর জন্য দুইখানা মাটির সানকিতে করিয়া কতকগুলি বড় পিঠা আনিয়া তার মা আমার সামনে রাখিল।

ইয়াসীন বলিল, "কবি ভাই! ডাকিয়া আনিয়া বড়ই কষ্ট দিলাম। সামান্য কিছু খান। আমরা গরীব মানুষ। আপনাদের খাওয়াইবার মত জিনিস কি আমরা তৈরি করিতে পারি?"

আমি একটি পিঠা মুখে দিতে দিতে বলিলাম, "আমিও ভাই তোমাদের মতই গরীব মানুষ। পিঠা তো বড় চমৎকার হইয়াছে।"

খাইতে খাইতে আসমানীর দিকে চাহিয়া দেখি সে পিঠা খাইতেছে না। আমি বলিলাম, "কিরে আসমানী। তুই যে পিঠা খাস না?"

আসমানী কোনই কথা বলে না। আমি তাকে বলিলাম, "আসমানী! লজ্জা কি? এই যে আমি খাইতেছি।"

এই বলিয়া একটি পিঠা আসমানীর মুখে পুরিয়া দিতে গেলাম। আসমানী অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া লইল। আমি আসমানীকে আরও আদর করিয়া কাছে টানিয়া বলিলাম, "কি হইয়াছে আসমানী! বল তো?"

আসমানী আমার কানের কাছে মুখ লইয়া ফিস ফিস করিয়া বলিল, 'ওরা যে বেবাইজা-বেদেজাতি। ওদের হাতের জিনিস আমরা মুসলমানেরা খাই না।"

আমি বলিলাম, "বেদে হইলে কি হইবে? ওরাও যে মুসলমান।"

"মুসলমান, তবে সাপ ধরে কেন? ওদের হাতের পানিও কোন মুসলমান খায় না।"

আসমানীর কথাগুলি শুনিয়া কি এক গভীর বেদনায় মন ভরিয়া উঠিল। এতো শুধু আসমানীর কথাই না। ওই আসমানীর কণ্ঠ ধরিয়া বাংলাদেশের শত শত মুসলমানের এই বেদে সমাজের প্রতি ঘৃণা যেন চক্ষে দেখিতে পাইলাম।

১৬ ❑ কেন বেদেরা অস্পৃশ্য থাকিবে?

এই বেদে সমাজ দেশের কতই উপকার করিয়া চলিয়াছে। পঞ্চাশ ষাট বৎসর আগে বাংলাদেশে সাপের ভয়ে রাতে পথ চলা যায় নাই। গ্রামে প্রভাত হইলেই একজন না একজনের সর্পাঘাতে মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়াছে। নৌকাবাসী এই বেদেরা দেশে দেশে ঘুরিয়া মানুষের শত্রু এই সাপকে তার গহীন গর্ত হইতে ধরিয়া শহরে চালান দিয়াছে। তাহাদের বিষ দাঁত ভাঙিয়া গ্রামে গ্রামে সাপ লইয়া খেলা করিয়া এই ভীষণ প্রাণীকে মানুষের আনন্দ বর্দ্ধনের সামগ্রী করিয়াছে।

আমাদের সমাজ ইহাদিগকে একঘরে করিয়া রাখিয়াছে। এত বড় অকৃতজ্ঞ জাতি আমরা!

কোথায় এই বেদে জাতিকে তার এই ভয়সঙ্কুল কাজের জন্য পুরষ্কৃত করিব, আর আমরা কিনা আজ তাহাদের সমাজ হইতে দূরে সরাইয়া রাখিয়াছি।

তারাও আল্লার বান্দা। আমাদেরই মতন তারা দুঃখে কাঁদে-সুখে হাসে। যেমন করিয়াই হোক এই পাপ আমাদের সমাজ হইতে তাড়াইতে হইবে।

আমি আসমানীকে বলিলাম, "আসমানী, আমি যখন খাইতেছি, তুইও খাঁ। আমারই যদি জাত যায়-তোরও না হয় জাত গেল।"

আসমানী আমার কথায় খাইতে প্রবৃত্ত হইল। আমি ইয়াসীনকে বলিলাম, "ইয়াসীন আমি তোমাদের এখানে একটি বনভোজনের বন্দোবস্ত করিব। গ্রামের সব লোকের সঙ্গে তোমরা একত্রে আহার করিবে।"

ইয়াসীন বলিল, 'কবি ভাই! আমাদের সঙ্গে আপনি খাইতে পারেন কিন্তু গ্রামের আর সব লোক আমাদের সঙ্গে খাইবে না।"

আমি উত্তর করিলাম, "যাহাতে তাহারা খায়, আমি সে ব্যবস্থা করিব। আচ্ছা ইয়াসীন। বাংলাদেশে কত বেদে আছে?"

'ইয়াসীন বলিল, 'কবি ভাই, আমরা যে সংখ্যায় কতজন বলিতে পারিব না। ঢাকা জেলায়, শহরের পাশে বুড়ীগঙ্গা নদীতে, মুন্সীগঞ্জে, মীরপুরে, ত্রিপুরা জেলায়, চাঁদপুরে" মতলব থানায়, ফরিদপুর জেলায়, অম্বি কাপুরের ছোট গাঙে, মাদারীপুরে, বরিশাল জেলায় "আমাদের অসংখ্য বেদে আছে। আর যে কোথায় আছে আমি বলিতে পারিব না।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, “আচ্ছা ইয়াসীন, তোমরা কি সকলেই সাপ ধরিয়া বেড়াও?’

ইয়াসীন উত্তর করিল, ‘না! কবি ভাই! আমরা সকলেই সাপ ধরার ব্যবসা করি না।

আমাদের একদল আয়না, চিরুণী, চুড়ী, মালা প্রভৃতি মনোহরী জিনিসপত্র লইয়া গাঁয়ে গাঁয়ে বিক্রী করিয়া বেড়ায়। হাটের দিন তাহারা হাটের মধ্যে দোকান সাজাইয়া বসে।”

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, “তারা কি স্ত্রী পুরুষ সকলেই এই কাজ করে?”

ইয়াসীন বলিল, ‘না! কবি ভাই! পুরুষলোকেরা নৌকায় বসিয়া নৌকা পাহারা দেয়, ছেলেমেয়ে দেখে, অবসর মত মাছ মারে, পাখি শিকার করে আর মাঝে মাঝে ঢাকা, চট্টগ্রাম প্রভৃতি শহরে যাইয়া দোকানের জিনিসপত্র কিনিয়া আনে। মেয়েরা সেই সব জিনিসপত্র ঝুড়িতে করিয়া গাঁয়ে গাঁয়ে বিক্রী করিয়া বেড়ায়।

বাড়ীতে যখন পুরুষ লোক থাকে না, তখনই তাহাদের কারবার হয় ভালো। বউদের হাতে কাঁচের চুড়ী পরাইয়া আয়না, চিরুণী, পায়ের আলতা সিঁথির সিন্দুর বেচিয়া তাহারা বেশ লাভ করে। হাটের দিন পশরা নামাইয়া হাটের এক কোণে দোকান সাজাইয়া বসে। এইদিন পুরুষ লোকেরা পাশে পাশে থাকে। সকলের মতলব ভাল না। যদিবা জোর করিয়া কিছু লইয়া যায়। এই সব বেদে জাতিকে ব্যবসায়ী বেদে বলে।

১৭ ☐ মাল বৈদ্য

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, “ইয়াসীন, তোমাদের একদল বেদেকে নাকি বলে ‘মাল বৈদ্য’। তাহাদের কথা কিছু বল।”

ইয়াসীন আরম্ভ করিল, ‘মাল বৈদ্য বেদেরাও আমাদেরই মতন নৌকায় বাস করে। তাহাদের মেয়েরা ঝুলীতে জড়ি বড়ি ঔষধ লইয়া শিঙা ফুঁকিয়া গাঁয়ে গাঁয়ে ঘোরে আর ছড়া কাটিয়া কথা বলে।

বুকে ব্যথা মাজার ব্যথা,
হাতের পায়ের গিরায় ব্যথা,
শিঙার ফুঁকে সরিবে বিষ

শুধুই কয়টি পয়সা দিস।
বউ এর কোলে সোনার ছেলে,
ফিরবে ঘুরবে হেসে খেলে।

মাথায়, মাজায়, হাতের পায়ের গিরায় ব্যথা হইলে সেইসব জায়গায় সামান্য ক্ষত করিয়া শিঙা লাগাইয়া কিছুটা ক্ষত বাহির করিয়া দেয়। অন্যান্য রোগের চিকিৎসার জন্য নানা রকম গাছ-গাছড়ার তৈরি জড়ী-বড়ি ঔষধ বিক্রী করে।"

আসমানী জিজ্ঞাসা করিল, 'কবিভাই! শিঙা কি রকম।"

আমি বলিলাম, "মৈষ মরিয়া গেলে তাহার শিং দিয়া শিঙা তৈরি করা হয়। সেই শিঙার গোড়াটি ক্ষতস্থানে লাগাইয়া শিঙার আগায় মুখ লাগাইয়া চুষিয়া কিছুটা রক্ত বাহির করিয়া আনে।"

ইয়াসীন বলিল, "কবি ভাই! ঠিকই বলিয়াছেন।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আচ্ছা ইয়াসীন, এখন তো ডাক্তারী বই এ কত রকম চিকিৎসা আর ঔষধ পত্রের কথা আছে। এখনও কি মাল বৈদ্যদের চিকিৎসার দরকার আছে ?"

ইয়াসীন বলিল, "আমি নিজেও ডাক্তারের চিকিৎসায় বিশ্বাস করি। কিন্তু এইসব মালবৈদ্যদের কাছে এমন সব ঔষধ আছে যা ডাক্তারী ঔষধের চাইতে বেশী কাজ করে।"

আমি বলিলাম "সত্যিই ইয়াসীন। সেবার চীন দেশে যাইয়া দেখিলাম সেখানকার বড় বড় ডাক্তারেরাও রোগীকে দুই রকমের ঔষধ দেয়।"

ইয়াসীন জিজ্ঞাসা করিল, "দুই রকমের ঔষধ দেয় কেমন কবি ভাই? কথাটা আর একটু বুঝাইয়া বলেন।"

আমি উত্তর করিলাম, "আমাদের দেশে যেমন মালবৈদ্য, কবিরাজ, হাকিম প্রভৃতি নানা রকমের চিকিৎসক আছেন, আর তাহারা বহু রকমের ঔষধ তৈরি করিয়া রোগীকে ভাল করেন চীন দেশেও তেমনি বৈদ্যরা বহু প্রকারের ঔষধ তৈরি করিয়া রোগীদিগকে ভাল করিতেন। কিন্তু ইউরোপ আমেরিকায় আজকাল রোগী ভাল করার আরো অনেক নতুন নতুন কলাকৌশল বাহির হইয়াছে। সেই সঙ্গে খুব তাড়াতাড়ি রোগ সারে, এমন সব বহু রকমের ঔষধও তাঁহারা তৈয়ার করিয়াছেন। চীনের ডাক্তারেরা সেইসব দেশের রোগ

সারানোর কলাকৌশল শিখিয়া তাহাদের কাছে জানা ঔষধের সঙ্গে নিজেদের দেশের প্রাচীন কালের ঔষধও ব্যবহার করিতেছেন। ইহাতে নাকি তাহাদের রোগী আরও তাড়াতাড়ি সারিয়া ওঠে।'

ইয়াসীন আবার জিজ্ঞাসা করিল, "তারা কি আগেকার দিনে সব ঔষুধই রোগী সারাইবার জন্য ব্যবহার করে ?"

আমি বলিলাম, "না, ইয়াসীন, আগেকার দিনের এমন সব ঔষধই তাহারা ব্যবহার করে না। ওদের ডাক্তারেরা যেই সব ঔষধপত্র পরীক্ষা করিয়া যেগুলি ব্যবহার করিলে রোগীর উপকার হয়, মাত্র সেইগুলিই কাজে লাগায়। এই যেমন ধর হাতের পায়ের ব্যথার জন্য মালবৈদ্যরা যেইসব ক্ষতস্থানে জখম করিয়া শিঙা গলাগায়, কিন্তু ইহাতে হাতের পায়ের ব্যথা সারে না। তার জন্য ভালমত ডাক্তারী ঔষধ আছে। কিন্তু মালবৈদ্যরা যেসব ঔষধ রোগীদিগকে দেয়, সে গুলি কি কি জিনিস দিয়া তৈরি, রোগী খাইলে তার কোন অপকার হয়, না-উপকার হয় এ সকল ভালমত জানিয়া তবে এগুলো ব্যবহার করিতে হইবে।"

জান ইয়াসিন, ইউরোপে এই ধরনের মালবৈদ্যদের রোগী সারানোর কলাকৌশল ও ঔষধপত্র হইতেই ডাক্তারী চিকিৎসার শুরু হইয়াছে। হয়ত এই সব মালবৈদ্যরা এককালে খুব বিখ্যাত চিকিৎসক ছিল। খুব একটা বড় সভ্যতার আমলে তারা খুব ভাল ভাল ঔষধ পত্রের খোঁজ রাখিত। তারপর কালের পরিবর্তনে সেই সভ্যতা নষ্ট হইয়া যায়। সঙ্গে সঙ্গে মালবৈদ্যদের অবস্থা খারাপ হইয়া পড়ে।

অন্য সভ্যতার সময়ে নতুন নতুন চিকিৎসকের উদয় হয়। মালবৈদ্যরা তাহাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় হারিয়া তাহারা গরীব হইয়া পড়ে।

এখন মাত্র কয়েকটি জড়ি বড়ি ঔষধ আর টুকটাক মন্ত্র-তন্ত্র পড়িয়া তাহারা সরল গ্রামবাসীদের ঠকাইয়া বেড়ায়।

তবু তাদের ঔষধ পত্রের মধ্যে যেগুলো এখনো কাজে লাগিতে পারে সেগুলোতে ভালমত পরীক্ষা করিয়া এখানকার চিকিৎসার সঙ্গে যোগ দেওয়া যাইতে পারে।"

ইয়াসীন জিজ্ঞাসা করিল, "কবি ভাই! এসব করিবে কাহারা ?"

আমি বলিলাম, "সারাটি দেশ জুড়িয়া, আমার শত শত ভাই বোন রহিয়াছে। চিঠিতে তাহাদের কাছে এসব কথা জানাইয়া দিব। তারা বড় হইলে দেশের

প্রাচীন কালে যত রকমের রোগ সারানোর কলাকৌশল সন্ধান করিয়া, চীনের মত সেগুলো আজকালকার রোগ সারানোর ঔষধ পত্রের সঙ্গে ব্যবহার করিবে।"

ইয়াসীন বলিল, "তাই যেন হয় কবি ভাই। দোয়া করি আপনার ছোট ভাই বোনেরা বড় হইয়া যেন আমাদেরও খোঁজ নেয়।"

আমি উত্তর করিলাম, "সেই জন্যই তো চিঠির পরে চিঠি লিখিয়া রাখিতেছি আমার ছোট ছোট ভাইবোনদের কাছে।

আচ্ছা ইয়াসীন! তুমি তো তিন রকমের বেদের কথা বলিলে। আমি কিন্তু আর এক রকমের বেদে দেখিয়াছি।"

ইয়াসীন জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায়?"

আমি বলিলাম, "যশোর জেলায় গাধা ও খচ্চরের উপর বিছানা পত্র হাড়িপাতিল বোঝাই করিয়া তাহারা এক জায়গা হইতে অন্য জায়গায় যায়। কোন বনের ধারে পুকুর বা দীঘি পাইলে সেখানে তাহারা তাবু গাড়িয়া কিছুদিন বাস করে। বন হইতে শূকর, খরগোশ, শেয়াল, খাটাস, সজারু, গুইসাপ প্রভৃতি ধরিয়া সিদ্ধ করিয়া বা আগুনে পোড়াইয়া খায়। ইহাদিগকে কেহ কেহ মেল্লছও বলে।

এক জঙ্গলের পশুপক্ষী মারা শেষ হইবে আগের মত গাধা বা খচ্চরের পিঠে মালপত্র বোঝাই করিয়া তাহারা অন্য এক জঙ্গলের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়। তোমাদের মত ইহারা নৌকায় বসত করে না। কোথাও ওরা ঘরবাড়ি বাঁধে না। সমস্ত দেশই ওদের ঘর। সমস্ত দেশই ইহাদের বাড়ি।

ইয়াসীন বলিল, "ইহারা আমাদের জাতের নয়। উহারা মেল্লছ।"

আমি বলিলাম, "আমার কিন্তু বেশ ভাল লাগে এদের সঙ্গে জঙ্গলে-জঙ্গলে ঘুরিতে। পশু-পাখি জন্তু-জানোয়ারের সঙ্গে পরিচয় করিতে।"

ইয়াসীন উত্তর করিল, "ওরা তো আপনার মত পশুপাখির সন্ধানই লইবে না। তাদের মারিয়া খাইবে।"

আমি বলিলাম, "তোমরাও পাখি মার। যাক এসব কথা।

শোন ইয়াসীন। এই মাত্র দেখিলাম আমার আসমানীর মত ছোট্ট মেয়েটিও তোমাদের হাতে খাইতে চাহে না। বল তো ইহা কত অন্যায়? মুসলমান সমাজের মধ্যে থাকিয়াও তোমাদিগকে আমরা আলাদা করিয়া রাখিয়াছি।

Scanned by roni060007

আমার ইচ্ছা তোমাদের সকল বেদেকে লইয়া একটা বড় সভা ডাকি। সেই সভায় তোমার সঙ্গে এক মাহফিলে আমরা ডাল ভাত খাইব। আর তোমাদের যত অভাব অভিযোগের কথা আলোচনা করিব।

তুমি কি সেই সভায় সকল বেদেকে দাওয়াত দিতে পারিবে?”

ইয়াসীন বলিল, “কেন পারিব না কবি ভাই! আপনি যখন বলিবেন তখনই তাহাদের ডাকিয়া এক জায়গায় জড় করিব।”

১৮ □ বেদে কনফারেন্স

উত্তর করিলাম, “বেশ। মতলব স্কুলের হেডমাস্টার আমার বন্ধু। তোমাদের জাতিকে ভালবাসেন। নাম ওয়ালীউল্লা পাটোয়ারী। আগামী মাসের চার তারিখ তার স্কুলেই বেদে সভা বসিবে। আমিও সেখানে যাইব। আজ আমি তাকে চিঠি লিখিয়া দিতেছি। ইতিমধ্যে তুমিও তোমার সব বেদে ভাইদের দাওয়াত দিতে থাক। আর শোন ভাই। তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। একটা ব্যাপার লক্ষ্য করিয়াছ? দিনে দিনে তোমাদের সংখ্যা কমিয়া যাইতেছে।”

“তাও লক্ষ্য করিতেছি কবিভাই। এই আমার বাপ যখন বাঁচিয়া ছিলেন তখন আমাদের দলে ২০০ নৌকা ছিল। এখন মাত্র ২০ খানায় আসিয়া ঠেকিয়াছে।”

“আর সব লোক গেল কোথায়?”

“তাহারা মারা গিয়াছে।?’

“ কি কি ব্যারাম তোমাদের হয় বেশি।?’

“আমাদের লোক মারা যায় ওলাওঠা, সান্নিপাতিক জ্বর আর বসন্ত ব্যারামেই বেশী।”

“কেন মারা যায় তাহা বুঝিতে পার ইয়াসীন?”

“আমরা কেমন করিয়া বুঝি কবিভাই?”

“শোন তবে বলি। নদীর পানিতে কলেরা সান্নিপাতিক রোগীর মলমূত্র ধোয়া হয়। তাতে নদীর পানি দূষিত হইয়া পড়ে। সেই পানি তোমরা খাও বলিয়া তোমাদের মধ্যে ওলাওঠা আর সান্নিপাতিক রোগ বেশী দেখা যায়।”

“সত্য কথা বলিয়াছেন কবি ভাই। একবার আমাদের নৌকায় ওলাওঠা রোগ দেখা দিল। দশ বার দিনের মধ্যে একশত লোক মারা গেল। সান্নিপাতিক

জ্বরেও তো সেবার পঞ্চাশ জন মারা গেল। এর কি উপায় করা যায় কবি ভাই?”

“উপায় তো ভাই তোমাদেরই হাতে। নদীর পানি তোমরা কখনো পান করিবে না। দেশে দেশে তোমরা ঘুরিয়া বেড়াও। আজকাল প্রায় সকল গ্রামেই টিউবওয়েল বসিয়াছে। টিউবওয়েলের পানিতে কোন রোগের জীবাণু ঢুকিতে পারে না। যদি কোনখানে টিউবওয়েলের পানি না পাও, তবে নদীর পানি তোমরা আগুনে ফুটাইয়া খাইবে। আগুনে ফুটান পানিতে কোন রোগের জীবাণু থাকিতে পারে না।”

কথায় কথায় সন্ধ্যা হইয়া আসিল। ইয়াসীনের নিকট হইতে বিদায় লইয়া ঘরে ফিরিয়া আসিলাম। কিন্তু সেদিন সারা রাত কিছুতেই ঘুমাইতে পারিলাম না।

ইয়াসীনকে তো উপদেশ দিয়া আসিলাম। তোমরা নদীর পানি ফুটাইয়া খাইবে। কিন্তু আমার উপদেশ কি তাহারা পালন করিবে? যুগ যুগা-ন্তরের কুশিক্ষায় তাহারা তো অন্ধ হইয়া আছে। ভদ্রতার খাতিরেই সে হয়ত আমার কথায় সায় দিল।

কিন্তু পানি ফুটাইতে তো পরিশ্রম করিতে হয়। টিউবওয়েল হইতে পানি সংগ্রহ করিয়া আনিতেও তো অনেক ঝামেলা। একদিনের মাত্র একটা উপদেশে ইহারা আমার কথা শুনিবে কেন? যদি কেহ দিনের পর দিন এদের মধ্যে থাকিতে পারিত, এদের ভালবাসিয়া এদের আপনার করিয়া লইতে পারিত তবে হয়ত, সে ভালবাসিয়া এদের যেসব কাজে ভ্রম তাহা দেখাইয়া দিত। তাহার কথা উহারা অমান্য করিতে পারিত না।

কিন্তু এমন লোক কি কেউ আমাদের দেশে কোনদিন জন্মাবে?

এই বেদে জাতির ভবিষ্যৎ ভাবিতে ভাবিতে মনে বড়ই ব্যথা করিতে লাগিল। দিনে দিনে ইহাদের সংখ্যা কমিয়া যাইতেছে। আর দু'একবার এদের নৌকায় কলেরা বা মহামারি আকারে বসন্ত দেখা দিলে ইহারা পৃথিবী হইতে লোপ পাইয়া যাইবে। কিন্তু মানব জাতির কি উপকারই না উহারা করিতেছে। দিনের পর দিন উহারা মানুষের মহা শত্রু সর্প দিগকে নাশ করিতেছে।

গর্ত হইতে বিষাক্ত সাপ ধরিয়া আনিয়া খেলা দেখাইতেছে। ঢাকা, কলিকাতা প্রভৃতি শহরে লইয়া গিয়া নানা রোগের ঔষধ তৈরি করিতে সাহায্য করিতেছে।

এদের প্রতি আমরা কিভাবে কৃতজ্ঞতা দেখাইতে পারি? শুনিয়াছি এদেশের যাহারা অনুন্নত জাতি, যাহারা বনে, পাহাড়ে বাস করে তাহাদের সংখ্যা যাতে কমিয়া না যায়, তাহারা যাতে সকল প্রকারের উন্নতি লাভ করিতে পারে দেশের গভর্ণমেন্টে তাহাদের জন্য একটি বিভাগ আছে। সেখান হইতে ইহাদিগকে নানাভাবে সাহায্য করা হয়। আমাদের এই বেদে সমাজ তো তাদেরই মতন। একবার গভর্ণমেন্টের সঙ্গে আলাপ করিয়া দেখিব যদি ইহাদের জন্য কিছু করা যায়।

নির্দিষ্ট দিনে মতলব হাইস্কুলে বেদে সভা বসিল। এই স্কুলের হেড্ মাষ্টার ওয়ালীউল্লা পাটোয়ারী সাহেবের নাম হয়ত অনেকেই শুনিয়াছেন।

তার শিক্ষকতায় পল্লী গ্রামের এই স্কুলটি হইতে প্রতি বৎসরই দুই চারটি ছাত্র বোর্ডের পরীক্ষায় উপরের স্থান লাভ করিয়া জলপানি পাইতেছে।

এই জন্যই আমি তাঁকে ভালবাসি না। তিনি রোজা-নামাজে পাক্কা মুসলমান। কিন্তু তার ধর্মমত তাঁকে গোড়ামীতে পরিণত করে নাই। একটি প্রাণ খোলা মন লইয়া তিনি হিন্দু-মুসলমান সকল মানুষকে ভালবাসেন।

তিনি তাঁর স্কুলের ছাত্র এবং মাষ্টারদের লইয়া বেদে সভার সমস্ত বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন।

মতলবের নদীতে হাজার হাজার বেদে নৌকা আসিয়া ভিড়িল। কত রকমের নৌকা, আর সেই সব নৌকার মেয়ে পুরুষ কত রকমের মানুষ। আমাদের মেয়েদের মত ওদের মেয়েরা ঘোমটা পরিয়া আর বসিয়া রান্না-বান্নার কাজেই জীবন কাটায় না।

পুরুষদের চাইতেও বেশীকাজ করে। সাপের ঝাঁপি মাথায় লইয়া গ্রামে গ্রামে খেলা দেখায়, কেহ কেহ জড়ি-বড়ি ঔষধের ঝুলী কাঁধে লইয়া পাড়ায় পাড়ায় রোগীর চিকিৎসা করে আর এক দল চুড়ী গয়না আয়না চিরুণী আলতা সিঁদূরের পসারী মাথায় লইয়া ঘরে ঘরে বউদের কাছে বিকি-কিনি করে। ওরা যেখানে যায় সেখানেই আনন্দ-সেখানেই হাসিখুশী।

ওদের নৌকায় নৌকায় পোষা ডাহুক, পোষা ঘুঘু, পোষা কেওড়া-কেওড়ী। তাদের সুমধুর ডাকে সমস্ত নদীর ঘাট মুখরিত হইয়া উঠিল।

হাজার হাজার বেদে-বেদেনী সভায় আসিয়া উপবেশন করিল। সে এক কি অপূর্ব দৃশ্য! মাটির সঙ্গে অভিমান করিয়া যাহারা কোন দিন মাটিতে ঘর বাঁধিল না, নৌকায় নৌকায় শত শত বৎসর ধরিয়া জীবন কাটাইল।

কত ঝড়ের রাতে ইহারা পদ্মা-মেঘনা-যমুনা নদীর ঢেউ-এর সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছে, মাসের শীতকে অবহেলা করিয়া নদীতে নদীতে মাছ ধরিয়াছে গরমকালের দারুণ রৌদ্র তাহাদের পথ চলাকে থামাইতে পারে নাই, আজ মাটিতে আসিয়া তাহাদের জাতির স্বার্থের কথা ভাবিতেছি।

এই সভার সভাপতির আসনে বসিয়া কত রকমের কথাই আমার মনে আসিল।

বেদে দলের দু-একজন মোড়ল দাঁড়াইয়া দু' একটি কথা বলিল। অনেক বড় কথা সুন্দর ভাষায় সাজাইয়া ওরা বলিতে পারে না।

দুঃখে ওরা কাঁদে কিন্তু সেই দুঃখের ভার কি করিয়া লাঘব হইবে তাহা উহারা জানে না।

একজন মোড়ল বলিল, "আমরা মুসলমান। সব মুসলমানের মত আমাদের একই আল্লা-একই কোরাণ-একই রসুল। কিন্তু দেশের মুসলমান ভাইরা আমাদের সঙ্গে আহার বিহার করে না।"

আর একজন বলিল, "আমরা কোথাও জমি কিনিয়া ঘর-বাড়ী তৈরি করিতে পারি না। কোন জমিদার আমাদের কাছে জমি বেঁচে না।"

সভায় কয়েকটি প্রস্তাব পাশ হইল ঃ

(১) দেশে যেমন সাঁওতাল, চাকমা, গারো প্রভৃতি উপজাতির উন্নতির জন্য সরকারের একটি বিভাগ আছে। বেদে সম্প্রদায়কে যেন তাহাদের মধ্যে গণ্য করিয়া তাহাদের ছেলেরা মেয়েরা যাহাতে লেখাপড়া শিখতে পারে ও চাকরী-বাকরিতে বিশেষ সুযোগ সুবিধা পায়, সরকার যেন তাহার ব্যবস্থা করেন।

(২) দেশের খাস-মহলে জমিতে বেদে সম্প্রদায়ের ঘরবাড়ি করার জন্য যেন অল্প দামে জমি দেওয়া হয়।

সভার কাজ শেষ হইলে বেদেদের সঙ্গে লইয়া খাওয়া-দাওয়া শুরু হইল। মতলব স্কুলের মাষ্টার ছাত্র ও সেখানকার বহুলোক বেদেদের সঙ্গে লইয়া একত্রে আহার করিলেন।

সে এক অপূর্ব দৃশ্য! ছাত্রদের মধ্যে কি উৎসাহ!

এই সভার কথা দেশের অনেকগুলো খবরের কাগজে ছাপা হইল।

সভার প্রস্তাবগুলি লইয়া অনেক বড় বড় সরকারী চাকুরে ও মন্ত্রী সাহেবদের সঙ্গে দেখা করিলাম কিন্তু কেহই আমার কথায় তেমন কান দিলেন না।

বেদেরা যদি সকলে একত্র হইয়া আরো সভা-সমিতি করিতে পারিত তবে হয়ত কাজ হইত। কিন্তু তাহারা নানা জেলায় নৌকায় নৌকায় ঘুরিয়া বেড়ায়। এ বিষয়ে আর কোন আন্দোলন হয় নাই।

এসব কথা চিঠিতে তো লিখিয়া রাখিলাম। আমার ছোট ছোট ভাই বোনেরা যখন বড় হইবে, তাহারা নিশ্চয় বেদে জাতির উন্নতির জন্য অনেক কিছু করিবে। এখনো তাহারা অভিভাবকদের কাছে বেদেদের দুঃখ দুর্দশার কথা বলিয়া তাহাদের সহানুভুতি বাড়াইতে পারিবে। এই আশা লইয়া আমি আরো বহুদিন বাঁচিয়া থাকিব।

আমি এখানে ওখানে ঘুরিয়া বেড়াই আর মাঝে মাঝে আমার সেই ছোট ঘরখানায় ফিরিয়া আসি। সেখানে প্রতিদিন আমার ছোট ছোট ভাইবোনেরা আমার কাছে আসিয়া লেখাপড়া করে। মাঝে মাঝে গল্প বলিয়া তাহাদের খুশী করি।

১৯ □ পীর সাহেবের মেয়ে পানিতে ডুবিল

সেদিন আমাদের গল্পের আসর বসিয়াছে। এমন সময় পীর সাহেবের বাড়ি হইতে দুই তিনটি লোক দৌড়াইয়া আসিয়া আমাকে বলিল, "কবিভাই। শিগ্‌গীর চলেন!"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি ব্যাপার? বলত ভাই!"

লোক দুইটি হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, "পীর সাহেবের মেয়েটি পানিতে পড়িয়া অজ্ঞান হইয়া আছে। আপনি তো এ বিষয়ে কত কিছু জানেন। আপনি শিগগীর চলেন।"

আমি তাড়াতাড়ি যাইবার জন্য তৈরি হইতেছি, এমন সময় আসমানী আমার হাত ধরিয়া বলিল, "না কবিভাই! আপনি যাইতে পারিবেন না।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেন বলতো সোনামণি?"

আসমানী বলিল, "আপনার মনে নাই কবিভাই? পীর সাহেবের লোকেরা কিভাবে সেদিন আমাকে তাড়াইয়া দিয়াছিল? আপনাকে অপমান করিয়াছিল?"

"কত খাবার জিনিস তার ছেলে মেয়েরা ফেলাইয়া ছড়াইয়া খায়। কি হইত ক্ষুধার সময় আমাকে কিছু খাবার দিলে? তার মেয়ে মরিতেছে মরুক। আপনি যাইতে পারিবেন না।"

আমি সস্নেহে আসমানীকে বলিলাম, "সোনা বোন। বিপদের সময় আপন পর ভাবিতে নাই। সেবার কাছে কোন শত্রু মিত্র যাহারা ভাবে, তাহারা সেবা করিতে পারে না। অত কথা বলিবার তো সময় নাই। বোন চল তাড়াতাড়ি যাই। মেয়েটাকে বাঁচাইতে হইবে।"

আসমানীকে সঙ্গে লইয়া এক রকম দৌড়াইয়াই পীর সাহেবের বাড়িতে ছুটিয়া আসিলাম।

যাইয়া দেখি বেহুশ মেয়েটিকে ঘিরিয়া পীর সাহেবের শিষ্যরা জিকির করিতেছে। পীর সাহেব তসবী হাতে মাঝখানে বসিয়া আছেন।

সব লোক ঘিরিয়া রহিয়াছে বলিয়া বেহুঁশ মেয়েটির গায়ে বাতাস লাগিতেছে না। একে তো পানিঁতে পড়া রোগী। এমনিই দম বন্ধ। তাহার উপর গায়ে বাতাস না লাগিলে রোগীর অবস্থা আরো খারাপ হইবে।

আমি যাইয়াই পীর সাহেবের সাগরেদদের সেখান হইতে সরিয়া অন্য জায়গায় যাইয়া জিকির করিতে অনুরোধ করিলাম।

তাহারা চলিয়া গেলে আমি মেয়েটির নাক মুখের দিকে লক্ষ্য করিলাম। দেখিলাম নাকে মুখে পুকুরের কাদা লাগিয়া আছে। রুমাল ভিজাইয়া প্রথমে আমি মেয়েটির নাক মুখ হইতে কাদা পরিস্কার করিয়া ফেলিলাম।

তারপর মেয়েটির মুখে মুখ লাগাইয়া মুখের ভিতর বাতাস ভরিয়া দিতে চেষ্টা করিলাম। কিন্তু মেয়েটির দাত লাগিয়া আছে। অনেক কষ্টে দাঁত ছাড়াইয়া দিয়া বার বার তার মুখের মধ্যে আমার মুখের বাতাস ভরিয়া দিতে লাগিলাম। মতলব, এই বাতাস মেয়েটির মুখের ভিতর দিয়া ফুসফুসে যাইয়া ফুসফুসের কাজ চালু করিয়া দিবে।

কিছুক্ষণ এরূপ করি আর মেয়েটির হাতের নাড়ী পরীক্ষা করি নাকের কাছে তুলা ধরিয়া দেখি, সে নিঃশ্বাস লইতেছে কিনা।

কিন্তু দশ বারো মিনিট এইভাবে মুখে ফুঁ দিয়াও দেখিলাম মেয়েটির নিঃশ্বাস প্রশ্বাস চালু হইল না।

সময় ত নষ্ট করা যায় না। আমার যা কিছু কলা-কৌশল আছে সবকাজে লাগাইতে হইবে। আহা! এমন সুন্দর মেয়েটি! হলুদের মত ডুগু ডুগু করিতেছে গায়ের বর্ন। যেন ঘুমাইয়া আছে।

এই মেয়েটিই সে দিন আসমানীকে কিছু খাবার দিতে যাইতেছিল। মুরব্বীদের বাধায় দিতে পারে নাই।

যেমন করিয়াই হোক-একে বাঁচাইতে হইবে। কিন্তু আমাকে উতলা হইলে চলিবে না।

বিপদের সময় কোন রকমের উত্তেজনা মনে আনিব না। মেয়েটিকে আমি বাঁচাইব-আমি তাকে বাঁচাইব। খোদা আমাকে শক্তি দাও।

পীর সাহেব নিজে আর তার পরিবারের লোকজন আছাড়ি পিছাড়ি কাঁদিতেছিল। তাহাদের কান্নায় আমি মাঝে মাঝে বিচলিত হইয়া পড়িতেছিলাম।

সবাইকে আমি হাত জোড় করিয়া বলিলাম, "আপনারা যদি এইভাবে কান্নাকাটি করেন তবে আমি চিকিৎসা করিতে পারিব না। ধৈর্য ধরিয়া আপনারা সকলে চুপ করিয়া থাকেন। আমার চিকিৎসায় হয়ত মেয়েটি বাঁচিবে।"

আমার কথায় সকলে চুপ করিল। আমি মেয়েটিকে উপুড় করিয়া শোয়াইলাম। উহাতে তাহার পেট হইতে কিছু পানি বাহির হইয়া গেল।

তারপর তার একখানা হাত বালিশের মত করিয়া মাথার নিচে রাখিয়া তাহার মুখখানি একপাশে ফিরাইয়া রাখিলাম। যাহাতে সে সহজে নিঃশ্বাস লইতে পারে।

তারপর আমি তার দুপায়ের গোড়ার দুই দিকে নিলডাউন হইয়া আমার দুই হাঁটু দুই দিকে রাখিয়া তাহাতে ভর দিয়া বসিয়া মেয়েটির পিঠের উপর যে প্রথম হাড় জোড়া তাহার উপর চাপ দিতে লাগিলাম দুই হাতের তালু লাগাইয়া প্রথমে আস্তে আস্তে তারপর একটু জোরে প্রতি মিনিটে পনের ষোলবার চাপ দিতে লাগিলাম। আস্তে আস্তে নিজের শরীরের ভরও এই চাপের উপর দিতে লাগিলাম।

আমাকে খুব সাবধানে মেয়েটির দুই থোড়ার দুই দিকে নিলডাউন হইয়া বসিতে হইল, যাহাতে তাহার থোড়ায় আমার হাঁটুর চাপ না লাগে।

এই ভাবে প্রায় আধ ঘন্টা কাটিয়া গেল। কিন্তু মেয়েটির নিঃশ্বাস প্রশ্বাস চালু হইল না।

এইরূপ করিতে আমি হয়রান হইয়া পড়িতেছিলাম। কিন্তু আমাকে হয়রান হইলে চলিবে না। প্রতিটি মিনিটের বদলে এই মেয়েটির জীবন। প্রতিটি পলের বদলে মৃত্যুর হাত হইতে তাহাকে ফিরাইয়া আনা যাইবে। আমাকে হয়রান হইলে চলিবে না। মেয়েটির মা কাঁদিতেছে। বাপ কাঁদিতেছে।

মেয়েটিকে তাদের কোলে ফিরাইয়া দিতে হইবে। যেমন করিয়াই হউক তাহাকে বাঁচাইব।

নিজের হয়রানী ভুলিয়া এইভাবে মেয়েটির পিঠে চাপ দিতে লাগিলাম।

আরো এক ঘন্টা কাটিয়া গেল। কিন্তু মেয়েটির নিঃশ্বাস এখনো বহিতেছে না। আমার হাত অবশ হইয়া আসিতেছে। পা অবশ হইয়া আসিতেছে। তবে কি এই জীবন যুদ্ধে আমি হারিয়া যাইব?

পীর সাহেবের একজন যুবক শিষ্য পাশে দাঁড়াইয়া ছিল। আমি তাহাকে কাছে ডাকিয়া বলিলাম, “আমি যেভাবে কাজ করিতেছি তুমি ভালমত তাহা লক্ষ্য কর। এরপর তোমাকে এই কাজ করিতে হইবে।”

তাহার সঙ্গে কথা বলিতে বলিতে আমি কিন্তু আমার কাজ আগের মতই করিয়া যাইতেছিলাম।

কিছু সময় পরে আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, “এবার তুমি আমার মত করিয়া মেয়েটির পিঠে চাপ দিতে পারিবে?”

সে বলিল, “পারিব।”

আমি বলিলাম, “তবে আমার মত দুইদিকে হাঁটু ভাঙিয়ে নিলডাউন হও।”

সে তাহা করিলে তাহাকে আগাইয়া আনিয়া মেয়েটির থোড়ার দুই দিকে আমার স্থানে বসাইয়া দিলাম।

প্রথমে সে ভুল করিতেছিল। কিন্তু দু একবার দেখাইয়া দিলে সে আমার মতই মেয়েটির পিঠে চাপ দিতে লাগিল।

আধঘন্টা পর্যন্ত আমি বিশ্রাম লইয়া ছেলেটিকে সরাইয়া আবার পূর্বের মতই মেয়েটির পিঠে চাপ দিতে লাগিলাম।

চাপ দেওয়ার সময় সেই ছেলেটিকে বলিলাম, “তুমি ভাই মেয়েটির নাকের কাছে তুলা ধরিয়া থাক। যদি তার নিঃশ্বাস ফিরিয়া আসে তবে তুলা নড়িবে। তখন আমাকে জানাইবে।” আরো এক ঘন্টা কাটিয়া গেল। মেয়েটির নিঃশ্বাস ফিরিয়া আসিল না। তবে কি সত্য সত্যই তাহাকে বাঁচাইতে পারিব না? আমাকে পরাজিত হইলে চলিবে না। বইতে পড়িয়াছি এরূপ চার ঘন্টা পর্যন্ত চাপ দেওয়ার পরেও অজ্ঞান ব্যক্তির জ্ঞান ফিরিয়া আসে।

আর মাত্র একটি ঘন্টা বাকি আছে। আমাকে নিরাশ হইলে চলিবে না। আরো মনোযোগের সঙ্গে মেয়েটির পিঠে চাপ দিতে লাগিলাম। এ সময়েও যখন মেয়েটির নিঃশ্বাস প্রশ্বাস চালু হইল না মেয়েটির মা বাবা ভাই বোন

আবার পূর্বের মত চিৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

পূর্বে যাহারা মেয়েটিকে ঘেরিয়া জিকির করিতেছিল, তাহাদের একজন আসিয়া বলিল, "আপনি সরিয়া যান কবি সাহেব! আপনার কেরামতি দেখা হইয়াছে। এখন আমরা আল্লার জিকির করিয়া দেখি-আমাদের শেষ চেষ্টা করিতে দেন।"

আমি বলিলাম, "আগে আপনারা জিকির আজগার করিয়াছিলেন। তাহাতে মেয়েটির নিঃশ্বাস চালু হয় নাই। ওইখানে দূরে বসিয়াই জিকির করিতেছেন। আমি তো তাহাতে বাধা দেই নাই।"

লোকটি বলিল, "দূরে বসিয়া জিকির করিলে তো তার সুর যাইবে না। কাছে বসিয়া জিকির করিতে হইবে।"

আমি বলিলাম, "আর আধঘন্টা সময় আমাকে দিন। আপনাদের খোদার কছম।"

পীর সাহেব ইঙ্গিতে তাহার শিষ্যটিকে কি বলিলেন। সে পূর্বের জায়গায় যাইয়া আগের মতই সকলেই মিলিয়া জিকির করিতে লাগিল।

আমি আরো মনেযোগের সংগে মেয়েটির পিঠে চাপ দিতে লাগিলাম। আর মনে মনে বলিতে লাগিলাম মেয়েটির যেন জীবন ফিরিয়া আসে। সে যেন বাঁচিয়া উঠে।

এইভাবে আরো পনের মিনিট কাটিয়া গেল।

যে ছেলেটি রোগীর নাকের কাছে তুলা ধরিয়াছিল, সে চিৎকার করিয়া উঠিল, "কবি ভাই! তুলা নড়িতেছে। মেয়েটি নিঃশ্বাস লইতেছে।"

তবে কি এই অসার দেহে জীবন ফিরিয়া আসিল ? আমার আশা পূর্ণ হইল ? কিন্তু আমাকে উতলা হইলে চলিবে না।

আমি আগের মতই আরো কতক্ষণ তার পিঠে চাপ দিতে লাগিলাম। মেয়েটির নিঃশ্বাস যখন স্বাভাবিক হইয়া আসিল তখন আমি তার পিঠ হইতে নামিয়া তাকে পাশ ফিরিয়া শোয়াইয়া দিলাম।

আস্তে আস্তে মেয়েটির জ্ঞান ফিরিয়া আসিল। সে উঠিয়া বসিতে চাহিল। আমি তাহাকে উঠিতে দিলাম না। যদি উঠিবার পরিশ্রমে তার দম আবার বন্ধ হইয়া যায়?

এখন আমি আস্তে মেয়েটিকে ধরিয়া হাতে লইয়া গিয়া তার বিছানায় শোয়াইয়া দিলাম। চাদর দিয়া তার গা ঢাকিয়া দিলাম। যাহাতে তাহার গায়ে

ঠান্ডা না লাগে।

আরো কিছুক্ষণ পরে পীর সাহেবকে বলিলাম, "এক কাপ সামান্য গরম দুধ আনিয়া দেন।"

দুধ আনা হইলে আমি চামচে করিয়া আস্তে আস্তে মেয়েটিকে খাওয়াইয়া দিলাম। তারপর তাহার বিছানার পাশে বসিয়া রহিলাম। ভাবিলাম আবার যদি মেয়েটির নিঃশ্বাস বন্ধ হইয়া যায় তবে পূর্বের মতই আবার আমাকে তাহার পিঠে চাপ দিয়া নিঃশ্বাস প্রশ্বাস আনাইতে হইবে। বই-এ পড়িয়াছি পানিতে ডোবা কোন কোন রোগীর দ্বিতীয়বার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়। মেয়েটির পাশে ঘন্টা খানেক বসিয়া থাকিয়া দেখিলাম সে বেশ ভালভাবে নিঃশ্বাস প্রশ্বাস লইতেছে। বুঝিলাম তাহার আর কোন ভয় নাই।

পীর সাহেব নিজে এবং তার শিষ্য সাহেবরা আমার কাজের যেভাবে প্রশংসা করিতেছিলেন তাহার হাত হইতে রেহাই পাইতে আসমানীকে সঙ্গে করিয়া তাড়াতাড়ি আমার আস্তানায় ফিরিয়া আসিলাম।

২০ ☐ আমার আস্তানায় পীর সাহেব

ইহার দুই তিন দিন পরে দেখিলাম, পীর সাহেব তার ছেলেমেয়েগুলিকে সঙ্গে করিয়া আমার আস্তানায় আসিয়াছেন। সঙ্গে এক হাড়ি মিষ্টি।

তাহাকে আদর করিয়া আমার কুঁড়ে ঘরে বসাইলাম। ছেলে মেয়েগুলি আমার ছোট ছোট ভাইবোনদের দলে মিশিয়া খেলা করিতে লাগিল।

কুশল আলাপের পর পীর সাহেব আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা কবি ভাই! আপনি তো আমার মরা মেয়েকে সেদিন বাঁচাইয়া তুলিলেন। প্রথমে আপনি আমার মেয়েকে মুখে ফুঁক দিয়া তার ফুস ফুস চালু করিতে চাহিয়াছিলেন কিন্তু দাঁত লাগিয়া মুখ যদি বন্ধ থাকিত তবে কি করিতেন?"

আমি বলিলাম, "মুখ বন্ধ থাকিলে আমি তাহার নাকের ভিতরে ফুঁক দিয়া তাহার ফুসফুসে বাতাস ভরিতাম। এরূপ করিলেও অনেক সময় রোগীর শ্বাসপ্রশ্বাস ফিরিয়া আসে।"

কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর পীর সাহেব চলিয়া গেলেন। তার ছেলেমেয়েগুলি ও আমার ছোট ছোট ভাইবোনদের সঙ্গে খুব হল্লা করিয়া পীর সাহেবের দেওয়া মিষ্টিগুলো খাইলাম।

২১ ◻ তাঁতী পাড়া

আসমানীর পরনের কাপড় ছিঁড়িয়া গিয়াছিল। তাহাকে সঙ্গে করিয়া সেইদিন তাঁতী পাড়ায় গেলাম, দেখি কম দামের একখানা শাড়ী কিনিতে পারি কিনা। প্রথমে গেলাম রূপাই মল্লিকের বাড়ি। এরা তাঁতী, কিন্তু এদের পদবী মল্লিক।

রূপাই মল্লিক খুব খাতির করিয়া তার বারান্দায় আমাদিগকে বসিতে দিল।

বলিলাম, "খুব কম দামের একখানা শাড়ী দিতে হইবে আসমানীর জন্য।"

রূপাই তার বউকে বলিল, "সেই কলমী লতা শাড়ীখানি আনিয়া দেখাও কবি ভাইকে।"

ভাবিলাম কলমীলতা যে শাড়ীখানার নাম, না জানি কি সুন্দর নকশাই না আছে তাহাতে। কিন্তু এত দামের শাড়ী কি কিনিতে পারিব আসমানীর জন্য?

বউ শাড়ী আনিয়া দিলে, শাড়ীখানা উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিলাম সাধারণ একখানা ডুরে কাটা রঙিন শাড়ী। এমন কোন চোখ জুড়ান নকশা তাহাতে নাই। তিন টাকা দাম। সেই শাড়ীখানা আসমানীকে কিনিয়া দিলাম। শাড়ীখানা পরিয়া আসমানীর রাঙ্গা টুকটুকে মুখখানি যেন শাড়ীর রঙে রঙিন হইয়া উঠিল।

আমি রূপাইকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "এমন প্রাণ জুড়ান শাড়ীর নাম, তার গায়ে তো তেমন নকশা দেখি না ?"

রূপাই বলিল, "আমাদের পূর্ব পুরুষেরা হয়ত এই শাড়ীতে এমনি অনেক সুন্দর সুন্দর নকশা বুনিত। কিন্তু সকলেই চায় সস্তা শাড়ী। আমাদের দাদার কাছে শুনিয়াছি, তিনি আরো বহু রকমের নকশী শাড়ী বুনিয়া হাটে লইয়া যাইতেন। এসব শাড়ী ত খুব ধরিয়া ধরিয়া অনেক দিন ধরিয়া বুনিতে হয়। সেই জন্য শাড়ীর দাম হইত বেশী। মিলের তৈরি সস্তাদরের শাড়ীর প্রতি লোকের ঝোঁক। এত যত্নে বোনা আমার দাদার তৈরি শাড়ী কেউ কিনিত না। চোখের পানি মুছিতে মুছিতে আমার দাদা হাট হইতে শাড়ী ফিরাইয়া আনিত।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমার দাদা কি কি নামের শাড়ী বুনিত ?"

রূপাই বলিল, "সে সব কথা আর শুনিয়া কি করিবেন কবি ভাই। মনখুশী,

দিলখুশী, গোলাপফুল, জলেভাসা, কদমফুল, রাসমন্ডল, নীলাম্বরী-কত রকমের শাড়ীই না বুনিত আগে তাঁতীরা। শাড়ীর নাম শুনিলেই চক্ষু জুড়াইয়া যায়।"

জিজ্ঞাসা করিলাম, "এখন কি তোমরা সে সব শাড়ী বুনিতে পার?"

সে উত্তর করিল, "ওই সব নামের শাড়ী এখন আমরা বুনি কিন্তু নাম মাত্রই সার। আগেকার দিনে শাড়ীতে যেসব কারুকাজ হইত তা আমরা এখন ভুলিয়া গিয়াছি।"

আমি বলিলাম, "আচ্ছা রুপাই! তোমরা প্রতিখানা শাড়ীতে কত লাভ কর?"

রূপাই উত্তর করিল, "আমাদের পোড়া কপালের কথা আর জিজ্ঞাসা করিবেন না কবি ভাই। স্বামী-স্ত্রী দুইজনে পরিশ্রম করিয়া তিন দিনে এক জোড়া শাড়ী বুনিতে পারি। তা বিক্রী করিয়া আমাদের মাত্র তিন টাকার মত লাভ হয়। বলেন তো, কবি ভাই! সব জিনিষেরই এখন দাম। এই মন্দার বাজারে এত অল্প টাকায় কি করিয়া সংসার চালাই? এক বেলা খাই ত আর এক বেলা খাই না।"

আমি বলিলাম, "তোমাদের বুনান শাড়ী ত বাজারে বেশ দামে বিক্রী হয়।"

রূপাই বলিল, "দাম হইলে কি হইবে কবি ভাই? আমরা তার অতি সামান্যই পাই।"

জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেন ভাই! বল ত?"

রূপাই আরম্ভ করিল, "আমাদের ত আর টাকা পয়সা নাই যে নগদ দামে সূতা কিনিব। বাজারে বা হাটে বহু মহাজন আছে। প্রত্যেক মহাজন একশ' বা দুইশ' তাঁতীকে বাকিতে সূতা দাদন দেয়। সেই মহাজনের কাছেই আমাদের বুনট করা শাড়ী কাপড় বেচিতে হয়। বাজার ঘুরিয়া যে কাপড়ের দাম যাচাই করিয়া বেচিব তাহার উপায় নাই। অপর মহাজনে আমার কাপড় কিনিবে না। আর কিনিতে চাহিলেও সে আসিয়া বাধা দিবে। সুতরাং আমার মহাজন দয়া করিয়া কাপড়ের দাম যা দেয় তাই আমাদের লইতে হয়।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,"প্রত্যেকখানা শাড়ীতে তুমি কত করিয়া পাও?"

রূপাই বলিল, "তিন টাকা কি সাড়ে তিন টাকা করিয়া পাই।"

আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "কিন্তু বাজারে ত তোমাদের শাড়ী আট টাকা-দশ টাকা করিয়া বিক্রী হয়।" রূপাই বলিল, "হইলে কি হইবে? কত হাট ঘুরিয়া আমাদের শাড়ী আমাদের কাছে যায় তা জানেন? প্রথমে ত

মহাজন আমাদের নিকট হইতে সস্তা দামে শাড়ী কিনিয়া লয়। বড় বড় মহাজনের ঘরে এক রকমের কল আছে। সেই কলের সাহায্যে কাপড়ে মাড় লাগাইয়া মহাজনের নামের ছাপ মারা হয়। তারপর কাপড় জোড়া ভালমত ভাঁজ করিয়া তার উপরে কাগজে ছাপা রঙিন লেবেল আটকান হয়। এতসব করিতে প্রত্যেক জোড়া কাপড়ে লাগে এক টাকার মত খরচ। তারপর মহাজনের নিকট হইতে কাপড় যায় জেলার মহাজনদের কাছে। সেখান হইতে যায় মহকুমার ছোট ছোট বাজার বন্দরের দোকানে। এরা প্রত্যেকেই লাভ করে। এইভাবে বহু হাত ঘুরিয়া কাপড় যায় আপনাদের কাছে। সেই সঙ্গে কাপড়ের দাম বাড়তেই থাকে। আমাদের কাপড় বেচিয়া কতজন করিয়া খাইতেছে-বড়লোক হইতেছে। আর আমরা যাহারা কাপড় বুনি তাহারা সকলেই গরীব হইয়া রহিলাম।"

আমি বলিলাম, "তোমাদের তাঁতীরা সকলে মিলিয়া যদি সমিতি কর, আর সেই সমিতি হইতে যদি সূতা বিলির আর কাপড় বিক্রীর ব্যবস্থা কর তবে তোমাদের অবস্থা এরূপ থাকিবে না।"

রূপাই বলিল, "কবি ভাই! সমিতি আমরা করিয়া দেখিয়াছি। সমিতির যাহারা হোমরা-চোমরা তাহারাই সব লুটিয়া খায়। আমাদের ভাগ্যে আদা আর কাঁচকলা। তাদের চাইতে চশমখোর মহাজন ভাল। তাহারা চীনে জোকের মত আমাদের রক্ত খায় বটে কিন্তু প্রাণে মারে না। প্রাণে মারিলে তো আমাদের দিয়া আর মুনাফা লুটিতে পারিবে না। .

আমি বলিলাম, "রূপাই। তোমাদের সকল অবস্থা চিঠিতে লিখিয়া আমার ছোট ছোট ভাই বোনদের জানাইব। তাহারা বড় হইয়া তোমাদের দুঃখ দুর্দশা ঘুচাইবে।"

রূপাই বলিল, "সে ত বহুদিনের কথা। ততদিন আমরা কি বাঁচিব?"

আমি বলিলাম নিরাশ হইও না ভাই। তোমাদের সব কথা চিঠিতে লিখিয়া আমার ছোট ছোট ভাই বোনদের জানাইলে তাহারা আবার এসব কথা, বাপ-মাদের জানাইবে। তারাই ত এখন দেশের সরকার চালনা করেন। ছোটরা যদি বড়দের কাছে আমার এই পরিকল্পনা তুলিয়া ধরে তবে তাঁহারা নিশ্চই তোমাদের জন্য কিছু করবেন।

রূপাই খুশী হইয়া বলিল, "আমাদের কথা খুব ভাল করিয়া লিখিয়া দিবেন কবিভাই। ঢাকা হইতে কয়েক মাইল দূরে ডেমরা বলিয়া একখানা গ্রাম

আছে। সেখানকার তাঁতীরা এখনও তিনশ চারশ টাকা দামের নকশী শাড়ী বুনিতে পারে। তাহাদের কথাও লিখিবেন।”

আমি বলিলাম, “চোখে না দেখিয়া ত আমি কিছু লিখি না। একদিন সেখানে যাইয়া তাহাদের সকল হাল হকিকত জানিয়া তবে তাহাদের কথা লিখিব।”

২২ □ গয়মানীর হাত কাটিল

আমি কথা বলিতেছি এমন সময় রূপাইর ছোট্ট মেয়েটি মাছ কুটিতে যাইয়া হাত কাটিয়া ফেলিয়াছে। আঙ্গুল দিয়া টসটস করিয়া রক্ত পড়িতেছে। রূপাইর বউ তাড়াতাড়ি ময়লা নেকড়া দিয়া তাহার হাতের আঙ্গুল বাঁধিতে যাইতেছিল। তাহাকে বাধা দিয়ে বলিলাম, এই নেকড়া দিয়া হাতের আঙ্গুল বাঁধিলে ময়লা হইতে নানা জীবাণু এই ঘায়ে ঢুকিয়া বিষাক্ত করিয়া তুলিবে।”

আমার কথায় বউটি নিরস্ত হইল। আমি তো গ্রামে গ্রামে ঘুরি। তাই আমার পকেটে কাগজে মোড়া পরিস্কার নেকড়া থাকে। তাই দিয়া মেয়েটির আঙুল ভালমত বাঁধিয়া দিলাম। রক্তপড়া বন্ধ হইল।

মেয়েটির গায়ের বর্ণ এমন রাঙা টুকটুকে! দেখিলেই আদর করিতে ইচ্ছা করে।

নাম তার গয়মানী। আট নয় বৎসরের বেশি বয়স হইবে না। আমি তাকে কাছে ডাকিয়া বলিলাম, “সোনামণি! আমার একটি কথা শোন। তোমার হাতের ঘা সারিলে তোমাদের ঘরে যে নেকড়া আছে তা সোডা পানিতে ভিজাইয়া সিদ্ধ করিবে। তারপর তা রৌদ্রে শুকাইয়া আমার মত এমনি গুটাইয়া রাখিবে। কখন কার হাত পা কাটে বলাত যায় না। তখন এই পরিস্কার নেকড়া দিয়া বাঁধিয়া দিবে।”

গয়মানী ঘাড় নাড়িয়া আমার কথায় সম্মতি জানাইল। রূপাই জিজ্ঞাসা করিল, “এতসব কেন করেন কবি ভাই।”

আমি রূপাইকে বলিলাম, “মাছ কুটিবার সময় মেয়েটির হাত কাটিয়াছে। মাছের গায়ে নিশ্চয় ময়লা ছাই মাখাইয়া মাছ কুটিতেছিল। সেই ছাই-এর সঙ্গে বিষাক্ত রোগের জীবাণু থাকিতে পারে। তাহাতে মেয়েটির টিটেনাস নামের রোগ হইতে পারে। তুমি ভাই মেয়েটিকে হাসপাতালে লইয়া যাও।

তাহারা বাঁধন খুলিয়া ক্ষতস্থানে ঔষধ লাগাইয়া দিবেন। আর যাহাতে তোমার মেয়ের টিটেনাস না হয় তার জন্য তোমার মেয়ের বাহুতে শুই দিয়া এক প্রকারের ঔষধ ভরিয়া দিবেন। এই ঔষধকে বলে এন্টিটিটেনাস।"

রূপাই আমার কথা অগ্রাহ্য করিয়া বলিল, "এমনি ত কতজনের কত জায়গা কাটিয়া যায়। তার জন্য কেহ ত ইনজেকসান লয় না। ঘা আপনা আপনি সারিয়া যায়।"

আমি বলিলাম, "আমাদের প্রত্যেকের শরীরের রক্তে এক প্রকারের সাদা সাদা রক্তকণা আছে। শরীরের ক্ষতস্থানে যদি বাহির হইতে কোন বিষাক্ত পোকা ঢোকে, তখন সাদা সাদা রক্তকণাগুলি শয়ে শয়ে হাজারে হাজারে আসিয়া সেই বিষাক্ত পোকাগুলির সঙ্গে যুদ্ধ করে। যুদ্ধে তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া একেবারে খাইয়া ফেলে। সেই জন্য সচরাচর সামান্য কাটা ঘা আপনা আপনি সারিয়া যায়।"

রূপাই বলিল, "সে ত ভালই। আমার মেয়ের কাটা আঙুলে যদি বিষাক্ত পোকা ঢুকিয়াই থাকে তবে তার রক্তের ভিতরে সাদা রক্ত কণাগুলি তা খাইয়া ফেলিবে।"

আমি বলিলাম, "লড়াইতে হার জিত আছে এ কথা মান?"

রূপাই ঘাড় নাড়িয়া বলিল, মানিব না কেন? নিশ্চই মানি।"

আমি উত্তর করিলাম, "তোমার মেয়ের ক্ষতস্থানে যে বিষাক্ত পোকা ঢুকিয়াছে তারা যদি খুব জোরদার হয়। আর মেয়ের শরীরের ভিতরের সাদা সাদা রক্তকণাগুলি যদি কমজোরী হয়। তখন তোমার মেয়ের টিটেনাস রোগ হইতে পারে।"

রূপাই বলিল, "যখন হয় তখন দেখা যাইবে। আগেই ভয় পাইয়া লাভ কি?"

আমি বলিলাম, "শহর এখান হইতে মাত্র দুই মাইল। সেখানে মেয়েটিকে লইয়া যাও। তাহারা এখনই ইনজেকসান দিয়া দিবে।"

কিন্তু আমার কথায় রূপাই কান দিল না।

তাঁতী পাড়া হইতে আসমানীকে সঙ্গে করিয়া আমি আমার নিজের আস্তানায় ফিরিয়া আসিলাম।

ইহার তিন চার দিন পরে আমি রাত্রে শুইয়া শুইয়া দেশের অগণিত তাঁতী ভাইদের কথা ভাবিতে লাগিলাম। সমস্ত দেশে কত লক্ষ লক্ষ তাঁতী আছে।

তাহারা প্রায় সকলেই রূপাই মল্লিকের মত গরীব। ইহাদের অবস্থা কি ফেরান যায় না? কাঠের একখানা তাঁত লইয়া ইহারা দেশের বড় বড় কাপড়ের মিলগুলির সঙ্গে যুদ্ধ করিতেছে। সেই সব মিলের মালিকদের সরকার কত ভাবে সাহায্য করে। দেশ বিদেশ হইতে মেশিন পত্র আনিবার জন্য ইহাদিগকে সরকার কোটি কোটি টাকার বিদেশী মুদ্রা ঋণ দেয়।

বিদেশে ভাল ভাল কাপড়ের কল আছে। সেই সব কলে বোনা কাপড় দেশী মিলে বোনা কাপড়ের চাইতে কত ভাল। সেই কাপড় যদি সহজে আমাদের বাজারে আসিতে পারিত তবে দেশের মিলে তৈরি কাপড় কেহ ছুঁইয়াও দেখিত না। দেশী মিলে তৈরি কাপড় গুলি যাহাতে প্রতিযোগিতায় টিকিয়া থাকিতে পারে সেই জন্য সরকার বিদেশ হইতে আনা কাপড়ের উপর বেশি অঙ্কের কর বসাইয়া দিয়াছেন। ইহা ছাড়া মিলের মালিকেরা সরকারের নিকট হইতে অল্পসুদে মোটা অঙ্কের টাকা কর্জ পাইয়া থাকে। ঘর হইতে একটি আধলা পয়সা বাহির না করিয়াও কতজন বড়বড় মিল পাতিয়া কোটি কোটি টাকা মুনাফা লুটিতেছে।

আর আমার দেশের এই নিরীহ তাঁতী সমাজ দিনে দিনে গরীব হইতে আরও গরীব হইয়া পড়িতেছে। আমার ছোট ছোট ভাই বোনেরা কবে বড় হইয়া দেশের এই তাঁতী সমাজকে রক্ষা করিবে?

বিছানায় শুইয়া শুইয়া এই সকল ভাবিতেছি এমন সময় রূপাই মল্লিক আসিয়া উপস্থিত।

“কবি ভাই!; শীগগীর চলেন আমার গয়মানীকে বুঝি আর বাঁচাইতে পারিব না।”

আমি তাড়াতাড়ি উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, “কেন কি হইয়াছে?”

রূপাই বলিল, “তিনদিন ধরিয়া মেয়ের গায়ে জ্বর। ভালমত কথা বলে না। সে হাত পা খিচাইতেছে।”

বুঝিতে পারিলাম মেয়েটির টিটেনাস হইয়াছে। আর এক মুহূর্ত দেরী করিবার উপায় নাই। মেয়েটিকে এখনই হাসপাতালে লইয়া যাইতে হইবে। তাড়াতাড়ি রূপাইকে সঙ্গে করিয়া তাহার বাড়িতে আসিলাম। আসিয়াই ধরাধরি করিয়া মেয়েটিকে হাসপাতালে লইয়া গেলাম। হাসপাতালের মেয়ে ডাক্তারটি রোগীদের প্রতি বড়ই দরদী। তিনি গয়মানীকে পরীক্ষা করিয়া সিভিল সার্জেনকে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

তারপর তিন চার দিন ইনজেকসান আর ঔষধ প্রয়োগ করিয়া যমের সঙ্গে ডাক্তাদের লড়াই চলিল। আমি পাশে বসিয়া কেবল ভাবিতে লাগিলাম আহা মেয়েটি যেন ভাল হইয়া ওঠে। সে যদি ভাল না হয় ওকে মৃত্যুর হাতে সঁপিয়া ওর বাবা-মা কেমন করিয়া ঘরে থাকিবে। পাঁচ দিনের দিন গয়মানী কিছুটা সুস্থ হইল।

লেডি ডাক্তার বলিলেন, "সময় মত যদি ইনজেকসান দেওয়া হইত, তবে মেয়েটির এত কষ্ট হইত না। একবার টিটেনাস হইলে রোগীকে বাঁচান প্রায়ই অসম্ভব হইয়া পড়ে। মেয়েটির কপাল ভাল যে আমাদের ঔষধে সে ভাল হইয়া উঠিতেছে।

এই কয়দিন রূপাই আর তার স্ত্রী ঘুমায় নাই। খায় নাই। প্রায় দিন রাত্র মেয়েটির পাশে বসিয়াছিল। আজ মেয়েটির অবস্থা একটু ভাল দেখিয়া তাহারা খাইতে গেল।

আরো চার পাঁচদিন পরে গয়মানী হাসপাতাল হইতে ছাড়া পাইয়া বাড়ি আসিল। আসমানীর মত গয়মানীও আমার একটি আদরের বোন হইয়া পড়িল।

একদিন রূপাই আসিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা কবি ভাই! কারো ক্ষত যদি খুব বেশি হয় আর যদি রক্ত পড়িতে থাকে তখন কি করিব?"

আমি বলিলাম, "ক্ষতস্থানে খুব কসিয়া পরিস্কার নেকড়া দিয়া বাঁধিয়া ডাক্তারের খোঁজ লইতে হইবে। ডাক্তার যা উপদেশ দেন সেই ভাবে কাজ করিতে হইবে।"

রূপাই জিজ্ঞাসা করিল, 'যদি কারো নাক দিয়া খুব রক্ত পড়িতে থাকে?"

আমি বলিলাম, "পরিস্কার তুলা বা নেকড়া নাকের ভিতর ঢুকাইয়া দিতে হইবে। তারপর ডাক্তার ডাকিয়া তার চিকিৎসা করিতে হইবে।"

রূপাই আবার জিজ্ঞাসা করিল, যদি কারো হাতে পায়ে সামান্য জায়গা কাটিয়া যায়, তখন কি করিয়া রক্ত বন্ধ করিব?"

আমি বলিলাম, "আষ্ঠাল গাছের ছাল বাটিয়া জখমের জায়গায় লাগাইলে রক্ত পড়া বন্ধ হয়। কারো দাঁতের গোড়া দিয়া রক্ত পড়িলে আষ্ঠাল গাছের ডাল দিয়া দাঁতন করিলে ঘা সারিয়া যায়। কিন্তু সাবধান, আষ্ঠালের ডাল যেন পানি দিয়া ভাল করিয়া ধুইয়া লওয়া হয়। গায়া পাতার রস জখমের জায়গায় লাগাইলেও রক্তপড়া বন্ধ হয়, কিন্তু এসব করিতে হয় কেবল অল্প জখমের

জন্য। হাতে বা পায়ে যদি বেশি জখম হয় গলগল করিয়া রক্ত পড়িতে থাকে, তবে সেই জখমের খানিকটুক উপরে শক্ত করিয়া একটি বাঁধন দিতে হয়। তারপর জখমী স্থানে নেকড়া দিয়া বা তুলা দিয়া ভালমত বাঁধিয়া তবে ডাক্তারের খোঁজ লইতে হয়।

সময় পাইলেই আসমানীকে সঙ্গে করিয়া আমি তাঁতী পাড়ায় গয়মানীদের বাড়ি যাইতাম।

গয়মানী আমাকে বন হইতে কাউয়ারঠুটি ফল আনিয়া দিত। বনের মধ্যে গাছ ভরিয়া কাউয়াঠুটি ফল ধরে। পাকিলে লাল টুক টুক করে। যখন পাকে তখন রাজ্যির কাক সেই ফল খাইবার জন্য গাছের চারিদিকে ঘোরে। যদি কেহ ফল টুকাইতে যায় কাক তাহাকে ঠোকর মারে। সেই জন্য ফলের নাম কাউয়াঠুটি।

গয়মানীদের বাড়ির সামনে জঙ্গল। একদিন তাহাদের বাড়ি গিয়াছি। গয়মানী আমাকে হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া গেল বনের ভিতর।

যাইয়া দেখি একটি শেওড়া গাছে থোপায় থোপায় কত ফল পাকিয়া আছে। সোনালী বর্ণ পাকা পাকা ফলগুলো দেখিয়া মনে হইল গাছটি যেন সোনার গয়ণা পরিয়া হাসিতেছে। আমাদের দেশে কত জায়গায় যে কত রকমের সৌন্দর্য! এই গহীন বনের মধ্যে এমন সুন্দর ফল ভর্তি গাছ যে আছে তা কখনো ভাবিতে পারি নাই। এ যেন গয়মানীর মতই একটি সুন্দর মেয়ে সারা গায়ে সোনার ফল জড়াইয়া হাসিতেছে। আমি, আসমানী আর গয়মানী তিনজনে মিলিয়া ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া শেওড়া ফল খাইতে লাগিলাম। কি মিষ্টি লাগে খাইতে! একেবারে মধুর মত । আরো একদিন গয়মানী আমাকে পাকা ডুমকুরের একগাছা মালা গাঁথিয়া আমার গলায় পরাইয়া দিল। সেই মালা হইতে একটা একটা করিয়া পাকা ডুমকুর ছিঁড়িয়া আসমানী আর আর আমি খুব মজা করিয়া খাইলাম।

আসমানীদের বাড়ির ধারের জঙ্গলে আরো কত রকমের মিষ্টি মিষ্টি ফল পাকিত।

ডুমুর গাছে ডুমুর পাকিলে পাড়ার ছেলেমেয়েরা গাছে উঠিয়া পাকা ডুমুর খাইত। আষ্টাল বা আশশেওড়া গাছের ফল পাকিলে তাহাও খাইতে বেশ মিষ্টি। জ্যৈষ্ঠ মাসে খেজুর গাছে কাঁধিতে কাঁধিতে খেজুর পাকিত। তখন খেজুর গাছের তলায় আসমানী আর গয়মানীর হাট বসিত। সারাদিন পাকা

খেজুর খাইয়াই পেট ভরাইত। গাব গাছে গাব পাকিলে তাহারা পাকা গাবের আঠি চুষিয়া মজা করিয়া খাইত।

ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের পক্ষে মিষ্টি খাওয়ার খুব দরকার। মিষ্টি খাইলে তাহাদের হাড় শক্ত হয়।

গ্রামের লোকেরা প্রায় সবাই গরীব। ছেলেমেয়েদের যে গুড় বা চিনি কিনিয়া খাওয়াইবে এমন পয়সা অনেকেরই নাই। তাই বন-মাতা গাছে গাছে মিষ্টি ফল ধরাইয়া ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের মুখে মিষ্টি তুলিয়া দেওয়ার ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছে।

গয়মানীদের বাড়ির পাশ দিয়া বাজারে যাইবার পথ। আমাকে দেখিলেই সে আসিয়া আমার হাত ধরিত। তাহাকে সঙ্গে করিয়া বাজারে যাইতাম। কোন কোন দিন তাহাকে এক পয়সার জিলাপী বা বাতাসা কিনিয়া দিতাম। এই সামান্য উপহার পাইয়া গয়মানীর মনে কি আনন্দ। আমিও তাকে না দেখিয়া থাকিতে পারিতাম না। প্রায়ই তাদের বাড়ি যাইতাম। তাদের বারান্দায় বসিয়া তার সঙ্গে নানা রকমের গল্প করিতাম।

ঘরের ভিতরে তার বাপ লাল নীল সুতা লইয়া কাপড় বুনিত।

তাদের উঠানে লাইন ধরিয়া পরপর কাঠি গাড়িয়া তার মা উঠান ভরিয়া হাঁটিয়া সেই কাঠির গায়ে নানা রঙের সূতা পরাইত। মনে হইত গ্রামলক্ষ্মীর রূপ যেন সেই সূতার রঙে রঙে ঘুরিত ফিরিত। কোন দিন বা গয়মানী নিজেই চরকা ঘুরাইয়া নলী ভরিত। আমার মনে গয়মানীর প্রতি যে ভালবাসা তাই যেন সুতো দিয়ে তার নলিতে জড়াইয়া পড়িত।

২৫। জামদানী শাড়ী

গয়মানীর বাবা রূপাই মল্লিকের উপদেশে একদিন আমি ঢাকা শহর হইতে বারো মাইল দূরে ডেমরা গ্রামের তাঁতীদের কাজ দেখিতে গেলাম। শীতলক্ষ্যা নদী পার হইয়া সামান্য একটু গেলেই ডেমরার তাঁতী পাড়া। প্রত্যেক বাড়িতে কত সুন্দর সুন্দর জামদানী শাড়ী তৈরি হইতেছে। দেখিয়া চক্ষু জুড়াইয়া যায়।

শাড়ীর উপরে কত রকমের নকশাই তাহারা বুনট করিয়া যাইতেছে।

একজন বৃদ্ধ তাঁতী তার নাম ছলিম মিঞা। তিনি আমাকে আদর করিয়া তার সঙ্গে বসাইলেন।

জিজ্ঞাসা করিলাম, "কারিকর সাহেব! আপনাদের সমস্যার কথা কিছু বলেন।"

ছলিম মিঞা উত্তর করিলেন, "আমাদের সমস্যার কথা কি আর বলিব! আগে শাড়ীর উপর যে সব ভাল ভাল নকশা বুনিতাম এখনকার বউঝিরা তা পছন্দ করে না। তারা চায় আমেরিকা, করাচি, লাহোর হইতে আনা চটকদার রঙের নাইলনের শাড়ী। যুবকেরা সেই সব শাড়ীর সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিতে সস্তা নকশার শাড়ী বুনট করে। এই সব শাড়ীর নকশার নমুনা শহরের বড় বড় দোকানদারেরাই দেয়।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি কি নিজেও সেই রূপ শাড়ী বুনট করেন?"

ছলিম মিঞা বলিলেন, "আমি সে রকমের শাড়ী বুনট করিনা। বাপ-দাদার আমল হইতে আমাদের তৈরি জামদানী শাড়ীর একটা সুনাম ছিল। পয়সার লোভে আমি সেই সুনাম নষ্ট করিতে চাই না।"

একজন অশিক্ষিত তাঁতী এক বেলা খায়তো আর এক বেলা খায়না। কিন্তু কি শ্রদ্ধা আর ভক্তির বলে তার পূর্বপুরুষ হইতে প্রাপ্ত শাড়ী বুনোনের কলা-কৌশল আজও সে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। মনে হইল আমার সকল অন্তর তার পায়ের কাছে বিছাইয়া তাঁকে আমার শ্রদ্ধা জানাই।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আগের দিনের মত নকশা করিয়া আরো কেউ কি শাড়ী বুনায়?"

ছলিম মিঞা উত্তর করিলেন, "আমার মতন আরো তিন চার জন বুড়ো তাঁতী আছে গ্রামে। আমাদের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সেই পুরান কালের নক্‌শা বুনট করা শাড়ীরও শেষ হইবে।"

ছলিম মিয়ার কথা শুনিয়া মনটা বড়ই বিষাদে ভরিয়া উঠিল। আহা! এত যে সুন্দর নক্‌শায় সাজানো জামদানী শাড়ী তাহা আর তৈরি হবেনা।

ছলিম মিঞাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "বলেন তো কেন এমন হইবে?"

একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া ছলিম মিঞা বলিলেন, "আগের দিনের নকশায় একজোড়া শাড়ী বুনাইতে তিনজনের আট নয় দিন লাগে কিন্তু সেই পরিশ্রমের দাম কেহই দিতে চাহে না।" ছলিম মিঞা আরো বলিলেন, "আগের দিনে আমাদের শাড়ী সুদুর বোম্বাই অঞ্চল হইতে আরম্ভ করিয়া পুবে রেঙ্গুন পর্যন্ত বিক্রী হইত। এক কোলকাতায় হাজার হাজার শাড়ী আমাদের গ্রাম হইতে যাইত।"

জিজ্ঞাসা করিলাম, “এখন যায় না কেন?”

ছলিম মিঞা বলিলেন, “জানেন তো দেশ স্বাধীন হইয়াছে। তাতে কত লোক আঙ্গুল ফুলিয়া কলা গাছ হইয়াছে। কিন্তু আমাদের তাঁতীদেরই মরণ। এখন আর আমাদের শাড়ী পূব দেশের বাহিরে যাইতে পারে না। শুনিয়াছি বাংলাদেশ স্বাধীন হইয়া এখন আমাদের শাড়ী ভারতের বহু জায়গায় যায় এটা খুব সুলক্ষণ।”

জিজ্ঞাসা করিলাম, “আগেকার দিনে পশ্চিম পাকিস্তানেও আপনাদের শাড়ী বিক্রী হইতে পারিত?”

ছলিম মিঞা উত্তর করিলেন, “সেখানকার মেয়েরা ছালোয়ার কামিজ পরে। শাড়ী যদি বা পরে তা নাইলনের শাড়ী। ঢাকা শহরেও ভদ্র মুসলমান মেয়েরা এখন শাড়ী পরা ছাড়িয়া দিয়াছে। পশ্চিম পাকিস্তানের মেয়েদের মত ইজার পরা ধরিয়াছে।”

আমার সারা অন্তর ছাপাইয়া একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস পড়িল। ছলিম মিঞা বলিতে লাগিলেন, “জামদানী শাড়ী বুনিতে খুব সরু সূতা লাগে। সেই সূতাও বিদেশ হইতে আসে। বড় বড় মহাজনেরা সেই সূতা গুদামজাত করিয়া রাখে। চোরা বাজার হইতে অনেক দাম দিয়া আমাদিগকে সেই সূতা কিনিতে হয়। তাই আমাদের বুনোট করা শাড়ীর দাম পড়ে বেশী।

আসেন সাহেব! ঘরের ভিতরে আসেন দেখিয়া যান আমাদের শাড়ী বুনান।”

আমার হাত ধরিয়া ছলিম মিঞা টানিয়া লইয়া গেলেন তাঁর ঘরের মধ্যে।

ঘরের ভিতর যাইয়া দেখিলাম, একজন বৃদ্ধ তাঁতী, কাপড় বুনিতেছে। এক পাশে একটি বালক সূতাগুলি টানিয়া এদিক ওদিক করিয়া দিতেছে। তাঁতের উপরে নক্‌শা শাড়ী বুনটের জন্য কাগজের ফর্মা। সরু সূতা দিয়া তাঁতের সঙ্গে আটকান আছে। অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিলাম। এরা সত্যিকার শিল্পী। রঙবেরঙের সূতা পরাইয়া শাড়ীর গায়ে নকশা বুনিয়া চলিয়াছে। কাগজে যাহারা ছবি আঁকে তাদের কত সম্মান। ওরা সূতার উপর নকশা করে। ফুল, লতা পাতা, শাড়ীতে আসিয়া জীবন্ত হয়। ছাপাও হয়। যাদের শুনিবার কান আছে তারা ওদের কথা শুনিতে পায়। শাড়ীর গায়ে সোয়ার হইয়া ওদের হাতের নকশাগুলো কত গাঁয়ের বউঝিদের গায়ে জড়াইয়া ঝলমল করে। তারাওকি এই নকশাগুলোর কথা শুনিতে পায়? বাংলার এই অখ্যাত শিল্প শ্রমিকদের প্রতি কি সরকারের কোন কর্তব্য নাই?

হায়রে মানুষের রুচি! সমাজ এদের জোলা বলিয়া অপমান করে।

ঘরের চালের সঙ্গে লটকান অনেকগুলি ফর্মা। এক এক রকমের নকশা শাড়ী বুনট করিতে এই ফর্মাগুলির এক একটি তাঁতের উপর টানাইয়া রাখিতে হয়।

একে একে ছলিম মিঞা ঘরের চালা হইতে এই ফর্মাগুলো পাড়িয়া আমাকে দেখাইতে লাগিলেন।

বলিলেন, "এইসব ফর্মাগুলি আমার দাদার আমলের। কত রকমের নকশারই না ফর্মা এখানে আছে। এগুলির দিকে চাহিলে আমার চোখে পানি আসে।

আমরা মরিয়া গেলে কে আর এই ফর্মাগুলি ব্যবহার করিতে আসিবে? আমরা বুড়োরা জিন্দিগী ভর লোকসানের কারবার করিয়া গেলাম। কেহই আমাদের দিকে চাহিয়া দেখিল না।"

এই বলিয়া ছলিম মিঞা তাঁর গামছার খেটে চক্ষু মুছিলেন।

তারপর বলিলেন, "সাহেব! ছেলেদের বলিয়া রাখিয়াছি, আমার মরণ হইলে এই ফর্মাগুলি যেন আমার কবরের মধ্যে ফেলিয়া দেওয়া হয়। এইভাবে টাঙান অবস্থায় ফর্মাগুলো পোকায় ইঁদুরে কাটিবে। কবরে যাইয়াও সে দুঃখ আমি সহিতে পারিব না।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আচ্ছা ছলিম ভাই! আগে আপনারা কি কি নামের শাড়ী বুনাইতেন?"

ছলিম মিঞা একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়িয়া বলিলেন, "কত রকমের যে শাড়ী আগের দিনে হইত তা গনিয়া শেষ করা যায় না। কয়টা শাড়ীর নাম করিব? জামদানী, কৃষ্ণ নীলাম্বরী, মেঘডমুর, গুয়াফুল, বেলী কদম্ব, জলে ভাসা, কলমী ফুল, গোলাপ ফুল, গঙ্গাজল, বালুচর, মধুমালা এইসব শাড়ীর নাম শুনিলেই কান জুড়াইয়া যায়।"

ছলিম মিঞার কাছ হইতে বিদায় লইয়া আবার আমার আস্তানায় ফিরিয়া আসিলাম।

মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম এক খানা ভাল নক্‌শা করা জামাদানী শাড়ীর দাম বেশী। আচ্ছা কোন কোন দেশের মেয়েরা তো গায়ে ওড়না পরে। ইউরোপের মেয়েরা গায়ে স্কার্ট পরে, এগুলো তো শাড়ীর মত অত বড় নয়। এই সব স্কার্ট বা ওড়নার উপর যদি জামদানী শাড়ীর নক্‌শা বুনট করা থাকে

তবে হয়ত বিদেশে এগুলির ক্রেতা পাওয়া যাইবে।

তা ছাড়া টেবিল ক্লথ. দরজা জানালার পর্দা, এগুলোতেও জামাদানী শাড়ীর নক্‌শা থাকিলে লোকে খুব পছন্দ করিয়া কিনিবে।

বহু দেশে আমাদের দূতাবাস আছে। সেইসব দূতাবাসে যদি তাঁতীদের তৈরী এইসব জিনিস বিক্রি করার ব্যবস্থা হয় তবে, তাঁতীরাও দুপয়সা বেশি পাইবে। সেই সঙ্গে আমাদের দেশও প্রচুর বিদেশী মুদ্রা উপার্জন করিতে পারিবে।

কিন্তু আমার এসব কথা কে শুনিবে? আমার ছোট ছোট ভাই-বোনেরা বড় হইলে কি আমার পরামর্শ মত কাজ করিবে? বড় আশা করিয়া চিঠির পাতায় এসব লিখিয়া রাখিলাম।

ইহার কয়েকদিন পরে ঢাকা হইতে বাসে উঠিয়া বাংলা ভারতের সব চাইতে বড় কাপড়ের বাজার বাবুর হাটে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। শুনিয়াছি এই হাটে যত কাপড় বিক্রী হয় পৃথিবীর আর কোন হাটে নাকি তাহা হয় না।

পূর্বে কলিকাতা, বোম্বাই. দিল্লী প্রভৃতি স্থান হইতে বেপারীরা আসিয়া শাড়ী, মশারি, জামা কাপড়ের থান প্রভৃতি কিনিয়া লইয়া যাইত পাকিস্তান। বাংলাদেশ-পাকিস্তান হইবার পরে তাহারা আর আসে না। এখন বাংলাদেশ স্বাধীন হইয়াছে। হয়ত ভারতের নানা প্রদেশ হইতে বেপারীরা আবার আসিতে আরম্ভ করিবে।

সকালে হাটের বাইরে রাস্তার ধারে যাইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। কত রকমের নক্‌শী পাড়ওয়ালা শাড়ীই না মাথায় করিয়া হাজার হাজার তাঁতী হাটে আসিতেছে। তাহাদের বোচকায় শাড়ীগুলো এমন করিয়া সাজান যেন প্রতিটি শাড়ীর নকশা করা পাড় চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া আছে। দূর হইতে মনে হইতেছিল শূন্যের উপর কত রকমের, কত রঙের ফুল এদিক ওদিক হইতে উড়িয়া আসিতেছে।

হাটের ভিতরে কি সমারোহে কেনাবেচা হইতেছে। এখানে একখানা দুইখানা শাড়ী কিনিবার উপায় নাই। পাইকারী দামে কুড়ি খানা করিয়া শাড়ী কিনিতে হয়। শাড়ী বেচিয়া তাঁতীদের বেশি কিছু লাভ হয় না। সে কথা তো রূপাই মল্লিকের সঙ্গে আলাপের সময় তোমরা শুনিয়াছ। তবু কোন রকমে এখানকার লোকদের চলিয়া যায়। রূপাই মল্লিকের মত অত অসহায় অবস্থা উহাদের নয়।

তাহার কারণ ঢাকা জেলার নরসিংদি হইতে আরম্ভ করিয়া মেঘনা নদীর ওপারে ত্রিপুরা পর্যন্ত যত তাঁতী আছে তাহাদের প্রত্যেকের বাড়িতে জাপানী তাঁত বসান আছে। এই তাঁতে কাপড় বুনাইতে অতি অল্প সময় লাগে। রূপাই মল্লিকের বাড়িতে দেখিয়াছি সেকেলে ধরনের তাঁত। সেই তাঁতে একজোড়া শাড়ী বুনাইতে যে সময় লাগে সে সময়ে জাপানী তাঁতে তিন জোড়া শাড়ী বুনান যায়।

এখানকার তাঁতীরা জাত তাঁতী নয়। তাহারা ক্ষেত খামারের কাজ করে। যখন ক্ষেতের কাজ থাকে না তখন তাহারা তাঁতে বসিয়া কাপড় বুনায়। ইহাতে কাপড় বুনিয়া যাহা আয় হয় এটা তাহাদের উপরি পাওনা। এই সব তাঁতীরা জামদানী শাড়ীতে যে সব নকশা থাকে তাহা বুনট করিতে পারে না। সেজন্য যাইতে হয় ডেমরায়।

পূর্বে জাপান হইতে তাঁত আনা হইত। এখন দেশের ছুতোর মিস্ত্রিরাই জাপানী তাঁত তৈরি করিতে পারে। কোন তাঁতের অংশ বিশেষ ভাঙ্গিয়া গেলে তাহারাই উহা মেরামত করিয়া দেয়।

বাবুর হাট হইতে ফিরিয়া আসিতে আসিতে ভাবিতে লাগিলাম এই কলকব্জার যুগে বাবুর হাটের তাঁতীরা মিলের তৈরি কাপড়ের সঙ্গে হাতের তৈরি শাড়ীর প্রতিযোগিতা করিয়া চলিয়াছে। সূতার উপর যদি কোন আবগারী কর না থাকিত তবে এই সব তাঁতীদের তৈরি কাপড়গুলি আরো সস্তায় বিক্রি হইতে পারিত।

যে দেশে লজ্জা নিবারণের বস্ত্রের অভাবে মেয়েরা গলায় দড়ি দিয়া মরে, সে দেশে শাড়ী কাপড়ের দাম আরও সস্তা হইলে কত ভাল হইত।

নিজের আস্তানায় আসিয়া বাঙালীর তৈরি সূতা বস্ত্রের উপর লেখা একখানা বই খুলিয়া বসিলাম।

হাজার হাজার বৎসর আগে এদেশের তাঁতীরা খুব পাতলা মসলীন নামক এক রকমের শাড়ী তৈরি করিত।

ঢাকা শহরের চারিদিকে এই সব তাঁতীদের বাড়ি ছিল। এই দেশের কার্পাস তুলা হইতে সূতা তৈরি করিয়া মসলীন বুনট হইত। খুব ভোরে, না আঁধার না আলোতে উঠিয়া কুমারী মেয়েরা খুব ধরিয়া ধরিয়া চরকা ঘুরাইয়া মসলীন শাড়ীর জন্যে সূতা কাটিত। বয়স্ক বা বৃদ্ধ মেয়েদের যাদের সাংসারিক ঝামেলা আছে এরূপ সূতা কাটিতে তাদের হাত কাঁপিয়া সূতা ছিঁড়িয়া যায়।

তাই কুমারী মেয়েরা যাহাদের সাংসারিক কোন ঝামেলা ছিল না তাহাদিগকেই এরুপ সূতা কাটার ভার দেওয়া হইত।

এক প্রহর বেলা হইবার আগেই সূতা কাটা শেষ করিতে হইত। কারণ রৌদ্রের তাপে সূতা তত মুলায়েম আর সরু হইত না।

শুনিয়াছি সে কালে একখানা এগার হাত শাড়ী হাতের আংটির মধ্যে ভরিয়া নতুন বধূকে উপহার দেওয়া হইত।

একবার এক তাঁতী তার তৈরি শাড়ীগুলি রৌদ্রে শুকাইতে দিয়াছে। এমন সময় এক সেপাই ঘোড়া ছুটাইয়া সেখান দিয়া চলিয়াছে।

তাঁতী তার সামনে যাইয়া কাঁদিয়া পড়িল, "থামেন থামেন, আমার সর্বনাশ করিবেন না।"

আশ্চর্য হইয়া ঘোড়া হইতে নামিয়া সেপাই জিজ্ঞাসা করিল, "এখানে তো বরাবর দুর্বাঘাস দেখিতেছি। এই ঘাসের উপর দিয়া ঘোড়া চালাইলে তোমার সর্বনাশ হইবে কিসে?"

তাঁতী বলিল, "খুব নজর করিয়া দেখেন। এখানে আমি কয়েক জোড়া শাড়ী রৌদ্রে শুকাইতে দিয়াছি।"

সিপাই আরও আশ্চর্য হইয়া দেখিল, "ভোরের নেহারের মত অতি পাতলা শাড়ীগুলি রৌদ্রে মেলিয়া দেওয়া হইয়াছে। নজরে আসে কি আসে না।"

সম্রাট আওরঙ্গজেবের কন্যা একখানা মসলীন শাড়ী পরিয়া পিতার সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছেন।

সম্রাট মেয়েকে আদর করিয়া বলিলেন, "মা! কি শাড়ী পরিয়াছ? তোমার শরীরের অনেক অংশ যে ঢাকা পড়ে নাই।"

মেয়ে লজ্জিত হইয়া বলিল, "আব্বা! সাত পাল্লা ভাঁজ করিয়া করিয়া আমি শাড়ী পরিয়াছি।"

আমার সোনামণি ভাই বোনেরা! ইহাতেই বুঝিতে পার আমাদের এই বাংলাদেশের তাঁতীরা পূর্বে কত সুন্দর সুন্দর শাড়ী বুনাইতে পারিত।

সেই সব শাড়ীতে কত রকমের নক্শাই না বুনট করা হইত। গাজীর গানের পালা হইতে সেই সব শাড়ীর একটি বর্ননা এখানে তুলিয়া দিব।

রাজকন্যার বিবাহ হইবে। সখিরা অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া জল্পনা-কল্পনা করিয়া রাজকন্যাকে একখানা শাড়ী পরাইল।

প্রথমে পরাইল শাড়ী নামে গঙ্গাজল,

জলেতে থুইলে শাড়ী করে টলমল।
হাতেতে লইলে শাড়ী হাতেতে মিশায়,
মৃত্তিকায় থুইলে শাড়ী পিঁপড়ায় লইয়া যায়।

কিন্তু সে শাড়ীও রাজকন্যার পছন্দ হইল না। নিজের দাসীকে পরাইয়া দিল।

তারপরে পরাইল শাড়ী তার নাম হিত,
হাজারো দুঃখীতে পরলে তারো আসে গীত।

সে শাড়ীও রাজকন্যা খুলিয়া অপর দাসীকে পরাইল। তারপর গুয়াফুল কলমীলতা কত রকমের শাড়ীই না দাসীরা পরাইল। কিন্তু কোন শাড়ী যখন রাজকন্যার মনের মত হইল না, তখন সব সখী মিলিয়া যুক্তি করিয়া পেটরা খুলিয়া খুব পুরান একখানা শাড়ী বাহির করিল। তাহাতে কত রকমের নকশা।

তারপর পরাইল শাড়ী তার নাম হিয়া
সেই শাড়ী পরিয়া হইয়াছিল চল্লিশ কন্যার বিয়া।

চল্লিশজন কন্যার বিবাহ যে শাড়ী পরিয়া হইয়াছিল তাহা রাজকন্যা পছন্দ না করিয়া কি পারে?

সেই শাড়ী খানার বর্ণনা তোমরা শোন।

শাড়ীর মধ্যে লেখা আছে আল্লা নিরঞ্জন
শাড়ীর মধ্যে লেখা আছে নবীজির আসন।
শাড়ীর মধ্যে লেখা আছে কেলী কদমের গাছ,
গাছে বসে ঠাকুর কৃষ্ণ বাঁশী বাজায় তাত।
শাড়ীর মধ্যে লেখা আছে হাঁসাহাঁসীর জোড়া,
শাড়ীর মধ্যে লেখা আছে আশী ডাঙর ঘোড়া।

ভাইবোনেরা মনে রাখিও, বাংলাদেশে হিন্দু মুসলমান এক সঙ্গে পাশাপাশি বাস করে। এই শাড়ীতে যেমন আল্লাহ নিরঞ্জন আর নবীজির আসন আঁকা আছে, তেমনি আঁকা আছে কেলী কদম্বের গাছ, তার ডালে বসিয়া হিন্দুরা দেবতা কৃষ্ণ বাঁশী বাজাইতেছেন। একখানা শাড়ী বুনাইতেও এদেশের তাঁতীরা হিন্দু মুসলমানের মিলনের কথা ভোলে নাই।

তারপর সেই শাড়ীতে বাংলাদেশের যত লতা পাতা পশুপাখি সব বুনট করা ছিল।

আমাদের এই পূর্ব বাংলাদেশের শাড়ীর লোভে কত দেশ-দেশান্তর হইতে

সওদাগররা এদেশে আসিত। গ্রীস, ইটালী, ফ্রান্স, ইংল্যান্ড, চীন, জাপান, সুমাত্রা, জাভা কত কত দেশেই না বাংলাদেশের শাড়ী যাইত। বাংলা, ভারত ও পাকিস্তানের কত কত প্রদেশে আমাদের শাড়ী বিক্রী হইত তার তো লেখা-জোখা নাই। বাংলাদেশ হইতে মধ্য প্রদেশ, পাঞ্জাব, উত্তর সীমান্ত প্রদেশ হইয়া খাইবার পাশ দিয়া কাবুল পারস্য আরব ছাড়াইয়া তুরস্ক ও গ্রীস দেশের মধ্যে দিয়া উট ও ঘোড়ার পিঠে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ শাড়ী ইউরোপের নানা বাজারে যাইয়া বিক্রী হইত।

সেইসব শাড়ীর বিনিময়ে নানা দেশ হইতে কত দ্রব্য-সামগ্রী আমাদের দেশে আসিত। কত দেশের সোনা-রূপা আসিয়া আমাদের দেশে বোঝাই হইত। বাংলাদেশের মসলীন কাপড়ের ব্যবসার নিয়ম কানুন লইয়া সেকালে গ্রীস দেশে একখানা আইনের বই লেখা হইয়াছিল। বড় একখানা অভিধানের চাইতে সেই বইখানা বড়।

ভাবিয়া দেখিও তো ভাইবোনেরা। আমাদের দেশের তাঁতীরা এক সময় কত বড় গৌরবের কাজ করিত।

আর আজ তাহারা কত অবহেলার পাত্র হইয়া পড়িয়া আছে।

২৪ □ গয়মানীর বিবাহ

কত জায়গাই তো আমি ঘুরিয়া বেড়াই। কিন্তু গয়মানীকে না দেখিয়া থাকিতে পারি না। তাই সুযোগ পেলেই ওদের বাড়ি যাই। এটা ওটা কিনিয়া উপহার দেই। ওর উপর কবিতা লিখিয়া গাঁয়ের লোকদের শোনাই।

একটা কবিতায় লিখিলাম গয়মানী যদি লেখাপড়া শিখিবার সুযোগ পাইত, ও নিজে পড়িয়া আরো কতজনকে পড়াইতে পারিত। গ্রামের লোকেরা চোখ থাকিতে অন্ধ। মা, না জানিয়া কলেরা রোগের দূষিত পানি নিজের ছেলেকে পান করাইয়া তাহাকে মৃত্যুর কোলে পাঠাইয়া দেয়। লেখা পড়া শিখিলে মা হইয়া আপন ছেলেটিকে সে মৃত্যুর হাতে সঁপিয়া দিত না।

আরো একটি কবিতা লিখিলাম।

রূপশালী ধান কার গায়ে ঝলমল করে,
সোদাল ফুলের হাসি কোন মেয়ের গা বহিয়া পড়ে।

নলের আগায় নল ফুল, হলদে পাখি যেমনি বন। আমার গয়মানীর রূপ তার চাইতেও সুন্দর।

এমনি কবিতা লেখায়, আর ঘন ঘন তাদের বাড়িতে যাওয়ায় পাড়ার সব লোকের দৃষ্টি গয়মানীর উপর পড়িল।

কারো বাড়ি পিঠা হইলে সে বাড়ির বউ গয়মানীকে ডাকিয়া আদর করিয়া পিঠা খাওয়ায়।

কারো বাড়ি বিবাহ হইলে গয়মানীকে সকলের আগে ডাক পাড়ে।

চিকন সুরের গলায় গয়মানী যখন বিয়ের গান ধরে তখন আকাশ বাতাস তার সুরে কাঁদে।

পাকান পিঠার উপরে সে সরু হাতের আঙুল ঘুরাইয়া সুন্দর নক্‌শা করিয়া দেয়। তা দেখিয়া বর পক্ষের লোকেরা ধন্য ধন্য করে। আরো বহু কারণে গ্রামের মধ্যে গয়মানীর বড়ই সুনাম।

এইসব গুণপনা আর তার উপরে লেখা আমার কবিতাই গয়মানীর কাল হইল।

সেদিন গয়মানীদের বাড়ি গিয়াছি। তার বাপ আমাকে দেখিয়া বড় উৎসাহিত হইয়া উঠিল।

"এই যে কবি সাহেব। আপনি আসিয়া গিয়াছেন। ভালই হইয়াছে। আগামী সোমবার গয়মানীর বিয়ে। আপনি সামনে থাকিয়া গয়মানীকে দোয়া খায়ের করিবেন।"

শুনিয়া আকাশ হইতে পড়িলাম। মাত্র নয় দশ বৎসর বয়স হইয়াছে গয়মানীর। এত অল্প বয়সে তার বিবাহ হইবে!

রূপাই মল্লিক হাসিয়া গদগদ হইয়া বলিল, "ভাল জামাই পাইয়াছি কবি সাহেব। সুলতানপুরের আলম মিঞার ছেলে ছহিরদ্দী।"

আমি বলিলাম, "ছহিরদ্দীকে ত আমি চিনি। পঁচিশ বছরের মত বয়স তার।"

রূপাই বলিল, "ঠিকই বলিয়াছেন কবি সাহেব। গয়মানীর উপর আপনি যে কবিতা লিখিয়াছেন তা নাকি পড়িয়া ছেলের নজর পড়িল আমার গয়মানীর উপরে। সে তার বাপকে বলিয়াছে, গয়মানীকে বিবাহ না করিতে পারিলে সে দেশান্তরী হইবে।"

আমি বলিতে যাইতেছিলাম, "রূপাই। তোমার একরত্তি ছোট মেয়ে-"

রূপাই আমাকে বাধা দিয়া বলিল, “আমি গরীব মানুষ কি সাধ্য আছে চান্দের উপর হাত তুলিতে।

কবি সাহেব। গয়মানীর নছিব যে চাঁদ আসিয়া তাহার মাথায় ভর করিল।”

আমি বলিলাম, “শোন রূপাই। তোমার মেয়ের বয়স এগার বৎসরের বেশি হয় নাই। বিবাহ দিলে অল্প বয়সে তার ছেলেপিলে হইবে। এমন কি সন্তান হইবার সময় তার জীবনেরও ক্ষতি হইতে পারে।”

রূপাইর বউ আমার সঙ্গে কথা বলে না। সে ঘোমটার তল হইতে বলিল, “কবি সাহেব! গয়মানীকে আপনি কত ভালবাসেন। তার এই শুভকাজে অমন অকথা কুকথা বলিবেন না।”

রূপাই বলিল, “কবি সাহেব! জানেন ত বিবাহ শাদী সবটাতেই আল্লার হাত। খোদাই আমার গয়মানীকে বড় লোকের ঘরে দিয়াছে। পায়ের উপর পা মেলিয়া সে খাইতে পারিবে। আর হাতে পায়ে নাকে গলায় কানে যেখানে যে গড়ন মানায় তাই তারা গয়মানীকে পরাইবে।”

আমি বলিলাম, “বিবাহ শাদী যদি আল্লার হাত, আমি যে বারণ করিতেছি, এটাও তো আল্লাহর হাত। তোমার গয়মানীকে তোমার চাইতে আমি কম ভালবাসি নাই। তার ভালর জন্য বলিতেছি এত অল্প বয়সে ওর বিবাহ দিও না।”

রূপাই বলিল, “ছেলের বাপ আমাকে পাঁচশ টাকা পণ দিয়াছে। বিবাহের খরচের জন্য আরও কিছু দিবে। এমন শুভ কাজে আপনি বিরূপ হইবেন না।”

বুঝিলাম, গরীব বাপ। এত টাকার মুখ কখন দেখে নাই। টাকার লোভে পড়িয়া গয়মানীকে বনবাসে দিতেছে।

আমি উত্তর করিলাম, “বিরূপ না হইয়া পারি না রূপাই। এমনি অল্প বয়সে বিবাহ হওয়ায় কত মেয়ের যে অপরিণত বয়সে সন্তান পেটে ধরিয়া মৃত্যু হইয়াছে তাহা গণিয়া শেষ করা যায় না। তুমি আমার কথা রাখ রুপাই। মেয়ের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া এ বিয়ে তুমি ভাঙিয়া দাও।”

বলিতে বলিতে রূপাইর হাত দুইখানা ধরিয়া কাঁদিয়া ফেলিলাম। “রূপাই আমার কথা রাখ। গয়মানীকে এখন বিবাহ দিও না। তোমরা ত গরীব মানুষ। টাকা পয়সা তোমাদের নাই। তোমার ঘরে গয়মানীর মত এমন যে

রূপসী মেয়েটি জন্মিয়াছে এটা তোমার ভাগ্য। আমি কথা দিতেছি আর কয়টি বৎসর সবুর কর। ওকে ত আমি লেখাপড়া শিখাইতেছি। আমি ওর জন্য ভাল বর খুঁজিয়া দিব।"

গয়মানীর বাপ কিছুতেই আমার কথা শুনিল না। আজ বাপ হইয়া এত আদরের গয়মানীকে সে বনবাস দিতে চলিয়াছে। হায় অশিক্ষা। হায় অন্ধ সংস্কার। কিছুতেই তার হাত হইতে গয়মানীকে উদ্ধার করিতে পারিলাম না।

আমার আস্তানায় ফিরিয়া আসিয়া কেবলই গয়মানীর পরিণামের কথা ভবিতে লাগিলাম। মনে পড়িল দেশে একটি আইন আছে। ষোল বৎসরের আগে কোন মেয়েকে বিবাহ দিলে পিতাকে আইনের হাতে শাস্তি পাইতে হয়।

ঘরে বসিয়া বসিয়া সরকারের কাছে একখানা দরখাস্ত লিখিয়া ডাকে পাঠাইয়া দিলাম।

কয়েক দিন পরে রূপাই মল্লিকের বাড়িতে গিয়াছি। সে ত পারে যদি আমাকে ধরিয়া মারে।

"কবি সাহেব! আপনার এই কাজ। আপনি সরকারের কাছে দরখাস্ত করিয়াছেন, যাতে গয়মানীর বিবাহ ভাঙিয়া যায়। আপনাকে ভাল লোক বলিয়াই জানিতাম। কিন্তু আজ দেখিতেছি আপনার মতলব খারাপ। আপনি আর আমার বাড়ি আসিবেন না।

রূপাই মল্লিকের কথাগুলি যেন ছিটা কঞ্চি দিয়া আমার পিঠে সপাত সপাত করিয়া আঘাত করিতে লাগিল।

গয়মানী আমাকে দেখিয়া হাসিয়া আমার কাছে আসিতেছিল। রূপাই তাকে ধমক দিয়া বলিল, "কার কাছে যাস শয়তান মেয়ে। ওদিক যা।"

চোখ দুইটি ছলছল করিয়া গয়মানী আমার দিকে চাহিয়া রহিল। আমি কিছু বলিতে যাইতেছিলাম। তার আগেই রূপাই বলিল, "কবি সাহেব। আমার বেয়াই আলতাফ মিঞাকে আপনি চেনেন না। তিন চারটা হাকিম সে পকেটে পুরিয়া রাখিতে পারে। সেখানে আপনার জারিজুরি খাটিবে না। আপনি এখনই আমার বাড়ি হইতে বাহির হইয়া যান।"

সত্য সত্যই আমার জারিজুরি খাটিল না। সরকার হইতে গয়মানীর বয়স জানিবার জন্য লোক আসিল। আলতাফ মিঞার প্রভাবে গ্রামের সকলেই সাক্ষ্য দিল, গয়মানীর বয়স সতর বৎসর। আমি খারাপ মতলবে গয়মানীর

বিবাহ ভাঙিয়া দিতে গিয়াছিলাম।

শুভ দিনে শুভক্ষণে খুব ধুমধামের সঙ্গে গয়মানীর বিবাহ হইয়া গেল। গ্রাম ভরিয়া আমার বদনামে ঢি ঢি পড়িয়া গেল।

শুনিয়াছিলাম, বিবাহের দিন গয়মানীর সে কি কান্না। শ্বশুর বাড়ি যাইয়াও সে কয়েকদিন ভাত পানি স্পর্শ করে নাই।

তার বরকে সে দুই চক্ষে দেখিতে পারিত না। এজন্য বর তাকে খুব মারিত। একবার মারিয়া তার পিঠে লম্বা দাগ করিয়া দিয়াছিল। তখন সে শ্বশুর বাড়ি হইতে পালাইয়া আসিয়াছিল। আসমানীকে সে বলিয়া পাঠাইয়াছিল, "কবি ভাইকে বলিস, আমার মতন জন্ম দুখিনী আর ত্রিজগতে নাই। তিনি যেন আসিয়া আমাকে দেখিয়া যান।"

কিন্তু কি করিয়া যাইব আমি! গ্রাম ভরিয়া আমার বদনামে ঢি ঢি পড়িয়া গিয়াছে। খবর শুনিয়া সকল অন্তর হাহাকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

বাড়ির বউ পালাইয়া আসিয়াছে ইহার চাইতে বদনামের আর কি আছে!

গয়মানীর শ্বশুর আসিয়া একদিন তাকে মারধোর করিয়া ছোয়ারীতে তুলিয়া লইয়া গেল। তারপর আর গয়মানীকে বাপের বাড়ি আসিতে দেয় নাই। এই সব খবর আমি আসমানীর মারফত পাইতাম। আর মনে মনে ব্যথা পাইতাম। এই দুনিয়ায় আমি এতই অসহায় আর ক্ষমতাহীন যে আমার এত দরদের গয়মানীর জন্য কিছুই করিবার শক্তি আমার নাই।

গয়মানীর বিবাহের পর গ্রামের কেহই দেখা হইলে আমার সাথে কথা বলে না।

আমার পাঠশালায় যেসব ভাইবোনেরা লেখাপড়া করিত তারা আজ অনেকেই আসে না। যে কয়জন আসে তাদের লইয়া আমি সময় কাটাই।

আমি ত জানি চোখ থাকিতে আমার দেশের লোক অন্ধ। ভালমন্দ তাহারা বুঝিতে পারে না। যে ভাল করিতে যায় নিজের বুদ্ধির জন্য তাহাকেই খারাপ বলিয়াভাবে।

কিন্তু আমাকে পরাজিত হইলে চলিবে না। এই মরা জাতিকে বাঁচাইতে হইলে আগে নিজে মরিতে হইবে। লোকের নিন্দা অবহেলা অলংকারের মত গায়ে পরিয়া আমাকে কাজ করিয়া যাইতে হইবে।

Scanned by roni060007

২৫ ❑ বৃক্ষ রোপন

আমার যে কয়জন ভাইবোন এখনো আমাকে ছাড়িয়া যায় নাই তাহাদের লইয়াই আমি সময় কাটাই। লেখাপড়ার অবসরে তাদের সঙ্গে লইয়া আমি গ্রামের পথে পথে ঘুরি।

এইভাবে ঘুরিতে ঘুরিতে দেখিলাম গ্রামের কারো কারো বাড়িতে পেয়ারা, আম, বাতাবী লেবু, প্রভৃতি ফলের গাছ আছে। কিন্তু আশেপাশের কোন কোন বাড়িতে ফলের গাছ নাই।

এক বাড়িতে দেখিলাম, গাছ ভরা কত পেয়ারা ধরিয়াছে। পেয়ারাগুলি যেমনি বড় তেমনি খাইতে মিষ্টি। আমি সেই বাড়ি হইতে তিন চারটি পাকা পেয়ারা কিনিয়া তাহার বিচি বাহির করিয়া এক জায়গায় চারা দিয়া রাখিলাম। আর এক বাড়িতে দেখিলাম নেংড়া আম ধরিয়া আছে। সেখান হইতে একশত পাকা আম কিনিয়া আমার ভাইবোনদের কাটিয়া কাটিয়া খাওয়াইলাম। আর আমের আঠিগুলি এক জায়গায় পুঁতিয়া রাখিলাম। এইভাবে বাতাবী লেবু, কাগজী লেবু, বড় জাম প্রভৃতি নানা ফলবান গাছের বীজ সংগ্রহ করিয়া থরে থরে চারা দিয়া রাখিলাম।

আসমানী আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "কবি ভাই! আপনি কি পাগল হইলেন নাকি? আপনার কতটুকুই বা জমি তার মধ্যে এত গাছের চারা লাগাইবেন কোথায়?"

আমি বলিলাম, "বীজ হইতে চারা উঠিতে অনেক দিন লাগিবে। তোমরা সবুর করিয়া থাক। দেখিবে এই বীজগুলি দিয়া আমি কি করি?"

ধীরে ধীরে আমার জমিতে সব রকম গাছের চারা বড় হইতে লাগিল। একদিন আমার ভাইবোনদের বলিলাম, "সোনামণিরা! শোন! আমি একবার চীনদেশে গিয়েছিলাম। সেখানে যাইয়া দেখিলাম, রাস্তার ধারে ধারে, বাড়িতে বাড়িতে শহরের এখানে সেখানে শুধু গাছ আর গাছ। স্কুলের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা, কলেজের ছাত্র ছাত্রীরা ছুটিছাটার দিনে গাছ লাগাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া ওঠে। শুধু লিচু, আনারস, আপেল প্রভৃতি মিষ্টি মিষ্টি ফলের গাছই তারা লাগায় না।

ওদের সরকার আগেই গাছ লাগাইবার একটি পরিকল্পনা করিয়া রাখিয়াছেন। সেই পরিকল্পনা মতে তাহারা এক এক জায়গায় এক এক রকমের গাছ লাগাইয়া চলে। প্রায় অধিকাংশ গাছে কোন খাইবার ফল ধরে না।

যে সব পাহাড়ে একটিও গাছ নাই, আর যেখানে যাইতে বাঘ-ভাল্লুকের ভয়, সেখানেও কলেজের ছেলেমেয়েরা দলবদ্ধ হইয়া গাছ-গাছালি লাগাইয়া দেয়। গরমের দিনে যখন বৃষ্টি হয় না তখন নিয়ম মত চারা গাছের গোড়ায় গোড়ায় পানি ঢালে।

দুই তিন বৎসরের মধ্যে সেই শূন্য পাহাড়ী জায়গায় গাছ গাছালিতে ভর্তি হইয়া যায়। আর একদল লোক যাইয়া তার আশেপাশে ফসলের ক্ষেত করে। যে জমিতে কিছুই ফলিত না সেখানে হাজার হাজার মন ধান, আলু. চীনে বাদাম জন্মে।"

আসমাণী আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা কবি ভাই, চীনদেশের লোকেরা গাছ লাগাইবার জন্য এত পাগল কেন?"

আমি বলিলাম, "চীনদেশের নেতারা সকলে মিলিয়া পরামর্শ করিয়া ঠিক করিয়াছেন গাছ গাছালি আকাশ হইতে মেঘ টানিয়া আনে। যে দেশে যত গাছ সে দেশে তত বৃষ্টি হয়।"

তোমরা ত জান, যে বছর বৃষ্টি হয় না সে বছর আমাদের দেশে আকাল পড়ে। বৃষ্টির অভাবে ধান, পাট, গম, তিল, কাউন সকল ফসল চারাগাছ অবস্থায়ই শুকাইয়া যায়। তাই চীনদেশের লোকেরা গাছ গাছালি লাগাইবার জন্য এত পাগল। ফলের গাছ গাছালি দেখিতেও কত সুন্দর!

একটি ভাই জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা কবি ভাই! চীনদেশের লোকেরা এত যে গাছ লাগাইতেছে তাতে কি ওদের দেশের ফসল বাড়িয়াছে।"

আমি বলিলাম, "শুধু বাড়িয়াছে বলিলেই বলা শেষ হইবে না। কতগুণ যে বাড়িয়াছে তা গনিয়া শেষ করা যায় না। আগেকার দিনে চীনদেশে দুর্ভিক্ষ লাগিয়াই ছিল। তখন পেটের জ্বালায় মানুষ, মানুষ পর্যন্ত খাইত। আমেরিকা হইতে বড় বড় ধনী লোকেরা চীনদেশে বেড়াইতে যাইত সেখানকার দুর্ভিক্ষ দেখিতে।

আর এখন চীনদেশে এত খাদ্য জন্মে যে, তারা বছর বছর বহু খাদ্য শষ্য চালান দেয়। আমাদের দেশেও বহু লক্ষ মণ চাউল চীনদেশ হইতে আসিত।"

আসমানী বলিল, "কবি ভাই! চীনদেশের গাছ লাগানোর গল্প আরো বলুন।"

আমি আরম্ভ করিলাম, "পিকিং শহর চীনদেশের রাজধানী। শহর ত নয় যেন ফুলের বাগান। রাস্তার ধারে ধারে গাছে গাছে কত রকমের ফুল ফুটিয়া

আছে। তোমাদের মত ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা পড়ার অবসরে সেই সব গাছের ঝরা পাতা ঝাটদিয়া একজায়গায় জড় করিয়া রাখে। বড় বড় লরী বোঝাই, সেই পাতাগুলি গর্তের মধ্যে পোঁতা হয়। পরে পাতাগুলি পচিলে জমিতে সার দেওয়া হয়। ইহাতে জমির ফসল আরো বাড়ে।

একবার একটা গ্রামে গিয়াছি, দেখিলাম কয়েকটি ছেলেমেয়ে লিচু গাছ লাগাইতেছে। ওদেশে প্রায় বারো মাস লিচু জন্মে। পাকা লিচুগুলো আবার ওরা শুকাইয়া রাখে। তাও খাইতে খুব মিষ্টি। সেই লিচু বোতলে ভরিয়া ওরা দেশ-বিদেশে চালান দেয়। যারা লিচু লাগাইতেছিল আমি তাদের বলিলাম, "আমাকে একটি গাছ লাগাইতে দিবে ভাই?"

ওরা খুশী হইয়া দুটি লিচুর কলম আমাকে দিল। মাটিতে গর্ত করিয়া আমি কলম দুইটি পুঁতিয়া দিলাম। মুখে বলিলাম, "এই গাছ দুইটিতে যখন লিচু ধরিবে তখন তোমরা আমার কথা মনে করিও।"

একটি সুন্দর ফুটফুটে মেয়ে বলিল, "এই গাছ দুটিতে লিচু ধরিলে আমরা মনে করিব, আমাদের এক বিদেশী ভাই এই গাছ দুইটি লাগাইয়া গিয়াছিলেন।"

হাসিতে হাসিতে আমি বলিলাম, "আবার যখন এ দেশে আসিব, তোমাদের সঙ্গে করে এই গাছের লিচু পাড়িয়া খাইব।"

মানুষের আশার ত শেষ নাই। কিন্তু কবে আবার সে দেশে যাইব আর আমার লাগান গাছ দুইটি কি তখন চিনিতে পারিব?

একটু দূরে দেখিলাম, রাঙা ফুটফুটে কয়টি ছেলেমেয়ে বেগুন ক্ষেত নিড়াইতেছে।

কাছে যাইয়া বলিলাম, "সোনামণিরা! একটা গান গাহিয়া শোনাইবে?"

তোমাদের যদি আমি গান গাহিতে বলিতাম কত ওজর আপত্তি করিতে। গলা ভাল নয় আর একদিন গাহিব ইত্যাদি কত কথা বলিতে।

চীনের ছেলেমেয়েরা কিন্তু বলা মাত্রই সকলে মিলিয়া গান আরম্ভ করিল। সে কি গান! যেন অনেকগুলি হলদে পাখি সুরে সুরে সমস্ত মাঠ ভরিয়া তুলিল। চীনা ভাষায় তাহারা গানে কি কথা বলিল বুঝিতে পারিলাম না।

হয়ত গানের সুরে সুরে তাহারা বলিল, "যত সব আগাছা নিড়াইয়া দিলে আমাদের বেগুন গাছগুলি ধীরে ধীরে বাড়িবে। কচি ছেলেমেয়ের মত সুন্দর সুন্দর বেগুনগুলি যখন ডালে ডালে দুলিবে তখন কি সুন্দর হইবে দেখিতে।

টুনটুনি পাখি আসিয়া এখানে রূপকথার কৌটা খুলিয়া কত বেঙ্গমা-বেঙ্গমীকে ডাকিয়া আনিবে।"

আমার আর একটি ভাই জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা কবি ভাই-চীনদেশের মত কি আর কোন কোন দেশের লোক এরূপ গাছ লাগাইবার জন্য পাগল হইয়া ওঠে?"

আমি বলিলাম, "সব দেশে তো আমি যাই নাই। কিন্তু রাশিয়ায় দেখিয়াছি সেখানেও এমনি যেখানে সেখানে গাছ। রাশিয়ার রাজধানী মস্কো শহরে গেলাম। সে ত শহর নয়-যেন বিরাট বনভূমি। তারি মাঝে মাঝে অফিস, আদালত, স্কুল কলেজ। একবার এক হাসপাতালে আমাকে কিছুদিন থাকিতে হইয়াছিল। সেই হাসপাতালের চারিদিকে শত শত হাজার হাজার গাছ।

মস্কো শহরের বাহিরে বহু মাইল জুড়িয়া বন আর বন। সেই বনের মাঝে মাঝে ঘরবাড়ি। এগুলিকে তাহারা বলে কানট্রি হাউস অর্থাৎ গ্রাম্য কুটীর। শহরের চাকুরেরা প্রতি শনি-রবিবারে বউ ছেলেমেয়ে লইয়া সেখানে যাইয়া আনন্দের হাট মিলায়। ছোটরা ঘুরিয়া ঘুরিয়া নানা রকম গাছগাছালির সঙ্গে পরিচিত হয়। গাছগাছালিকে ভালবাসিতে শেখে।

যুগশ্লোভিয়া দেশের জেগ্রিবে যাইয়া দেখিয়াছি, শহরের মাঝখানে একটা বিরাট জঙ্গল। শহরের ছেলেমেয়েরা সময় পাইলেই সেই জঙ্গলে যাইয়া ঘোরাফেরা করে।"

আসমানী জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা কবি ভাই! আমাদের দেশে জঙ্গল নাই।"

আমি বলিলাম, "কেন থাকিবে না কেন। খুলনা জেলা হইতে ত্রিশ মাইল দূরে হাজার হাজার মাইল জুড়িয়া বঙ্গ সাগরের তীরে সুন্দর বন। এই বনে কত লক্ষ লক্ষ গাছ আছে। সেই বন পাহারায় আছে রয়েল বেঙ্গল টাইগার-সুন্দরবনী বাঘ। বড় বড় অজগর আর পানিতে হাঙ্গর-কুমীর। এদের ভয়ে কেহই এই বনের গাছগাছালি চুরি করিয়া কাটিতে পারেনা।

চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও সিলেট জেলায় অনেক বড় বড় জঙ্গল আছে। আমাদের ঢাকা শহরের সামান্য দূরে ত জয়দেবপুর। সেখানে বিরাট শাল বন। পাতায় পাতায় ডালে ডালে জড়াজড়ি করিয়া যেন কত কালের মায়া মমতা বিস্তার করিয়া আছে।

এই সব বন আছে বলিয়াই এখনো আমাদের দেশে বৃষ্টি হয়। কিন্তু দেশের

সব লোক তো ভাল নয়। তাহারা সুন্দর বনে যাইয়া বাঘ, ভাল্লুক, অজগর মারে। নদীগুলো হইতে বন্দুকের গুলিতে হাঙ্গর কুমীর মারে। এইভাবে যদি চলিতে থাকে তবে এমন যে সুন্দরবন তাহা একদিন মরুভূমিতে পরিণত হইবে। কারণ বাঘ ভাল্লুক, অজগর, হাঙ্গর-কুমীর যদি না থাকে তবে লোকে চুরি করিয়া সুন্দর বনের গাছগাছালি কাটিয়া আনিয়া লাকড়ি বানাইবে।

আমাদের বন্ধু আবদুল জলিল সাহেব তোমাদের পড়ার উপযুক্ত করিয়া, 'সুন্দর বন' নামে একখানা বই লিখিয়াছেন। তাহা পড়িয়া সুন্দর বনের বিষয়ে তোমরা অনেক মজার মজার খবর জানিতে পারিবে।

আমার কথা শেষ হইতে না হইতেই আমাদের ছোট ভাইবোনেরা এক সঙ্গে বলিয়া উঠিল; "কবি ভাই! চীনের ছেলেমেয়েদের মত আমরাও গ্রামের যেখানে সেখানে গাছ লাগাইব।"

আমি বলিলাম, "সেইজন্য ত কতদিন আগে আমি, পেয়ারা, আম, জাম, লেবু, বাতাবী লেবু গাছের বীজ পুতিয়া রাখিয়াছি। এখন বীজ হইতে বেশ বড় বড় চারা উঠিয়াছে।

তোমরা এক একজন এক এক রকমের চারা সামান্য মাটিশুদ্ধ তুলিতে থাক। প্রত্যেকে একটা করিয়া কাঠি হাতে লও। তাই দিয়া খুব সতর্কের সঙ্গে চারাগুলো তুলিবে। এমনভাবে তুলিবে চারাগুলি যেন ব্যথা না পায়।"

তাহারা ভালমত চারা তুলিতে পারিতেছিল না। আমি কাঠি দিয়া মাটিশুদ্ধ চারা কিভাবে তুলিতে হয় দেখাইয়া দিলাম।

তারপর এক এক জন দশবারোটা চারা তুলিলে আমি তাহাদের সঙ্গে করিয়া প্রথমে ছলিমদ্দি মিঞার বাড়ি গেলাম। ছলিমদ্দি মিঞা এতগুলি ছেলেমেয়ের সঙ্গে আমাকে তার বাড়িতে দেখিয়া বড়ই খুশী হইয়া আমাদিগকে বসিতে বলিলেন। আমি বলিলাম, "ছলিম ভাই। আমরা বসিতে আসি নাই। আপনার বাড়িতে ত পেয়ারা গাছ নাই। বাতাবী লেবুর গাছও নাই। আপনার বাড়িতে আমরা কয়েকটি ফলের গাছ লাগাইয়া দিতে চাই। এ বাড়ি ও বাড়ি পেয়ারা, আম, বাতাবী লেবু কত রকমের ফলের গাছ আছে। আপনার বাড়ির ছেলেমেয়ে সেই সব গাছে ফল পাকিলে চাহিয়া থাকে। আপনি যদি বলেন আপনার বাড়িতে কয়েক রকম ফলের চারা লাগাইয়া দিয়া যাই।"

ছলিমদ্দি মিঞা বলিলেন, " এ ত বড়ই খুশীর কথা কবি সাহেব, তা চারাগুলির জন্য দাম দিতে হইবে কত?"

আমি বলিলাম, "কোন দাম দিতে হইবে না। আপনি দেখাইয়া দেন কোথায় কোন গাছ লাগাইব।"

ছলিমদ্দিন মিঞা আমার হাত হইতে কোদাল কাড়িয়া লইয়া জায়গায় জায়গায় মাটি কোপাইয়া গুঁড়া করিয়া দিতে লাগিলেন। পচা গোবরের সার ত তার বাড়িতেই ছিল। সেই সার টুকরীতে করিয়া আনিয়া মাটির সঙ্গে মিশাইয়া আমার ছোট ছোট ভাইবোনেরা আম, পেয়ারা, বাতাবীলেবু, কাগজী লেবু প্রভৃতি গাছ লাগাইয়া দিল। তারপর কলসীতে করিয়া পানি আনিয়া সেই সব চারা গাছের গোড়ায় খুব আস্তে আস্তে পানি ঢালিতে লাগিল। পানি জোরে ঢালিলে চারাগুলির গোড়া উঠিয়া যাইত।

এর পর গোলাম রহিমের মার বাড়িতে। রহিম আমার একটি ভাই। সেও সঙ্গে আসিয়াছে। তাহাদের বাড়ির চারধারে পিঠলি, শেওড়া, কানাইলাঠি, হিজল প্রভৃতি কত রকমের জংলা গাছ।

আমি রহিমের মাকে বলিলাম, "আপনার বাড়িতে যে সব জংলা গাছ আছে যেগুলোতে কোনই ফল ধরে না। এই সব গাছ লাকড়ীওয়ালেদের কাছ বিক্রী করিয়া দিবেন। এখন ঐসব গাছের জায়গায় আমরা ল্যাংড়া আম, পেয়ারা, বাতাবী লেবু, কাগজী লেবু প্রভৃতির চারা লাগাইয়া দিয়া যাইব। এই চারাগুলো যাহাতে গুরু ছাগলে খাইয়া না ফেলে সেজন্য এগুলোর চারিদিকে ভাল মত বেড়া দিয়া রাখিবেন।"

এইভাবে গ্রামের প্রায় প্রত্যেক বাড়িতেই চারাগুলি লাগাইয়া ফেলিলাম। আলম মিঞার বাড়িতে যাইয়া দেখিলাম প্রকান্ড দুইটি আমের গাছ। বুড়ো হইয়া গিয়াছে। এখন আর আম ধরে না। যাও বা দুএকটি আম ধরে তা এমন টক যে কেহই মুখে দিতে পারে না। তাকে যাইয়া বলিলাম, "আপনার এই আমগাছ দুইটি কাটিয়া ফেলান। আমি আপনার বাড়িতে ল্যাংড়া আমের চারা লাগাইয়া দিতেছি। দেখিবেন তিন চার বৎসর পরেই কি সুন্দর আম ধরিবে। যেখানে যত আম আছে ল্যাংড়া সবার সেরা। পাকিলে সব চাইতে মিষ্টি লাগে।"

আলম মিঞা আমার কথায় সায় দিলেন। তাঁর বাড়িতে তিনটি ল্যাংড়া আমের চারা লাগাইয়া দিয়া আসিলাম।

ফলের চারা লাগাইয়া আমরা চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম না। আমার ছোট ছোট ভাইবোনদের বাড়ি বাড়ি পাঠাইয়া খোঁজ লইতে লাগিলাম চারাগুলোর যত্ন হয় কিনা। তোমাদের বাপ-মা'রা যেমন তোমাদের সব সময় চোখে চোখে রাখে, পরিস্কার করিয়া স্নান করায়, ভালমত খাওয়ায় গাছেরও তেমনি যত্ন লইতে হয়।

গাছের গোড়ায় আগাছা থাকিলে তাহা নিড়াইয়া পরিস্কার করিয়া দিতে হয়। গোড়ার মাটি শক্ত হইয়া গেলে গাছের শিকড় দম লইতে পারে না। সেই জন্য চারা গাছের গোড়ার মাটি মাঝে মাঝে নিড়ানী দিয়া আলগা করিয়া দিতে হয়। কোন গাছ যদি ভালমত না বাড়ে আধমরা হইয়া থাকে তবে তাহার গোড়ায় পচা গোবরের সার দিতে হয়। আর যাহাতে ছাগল গরু চারাগুলি না খাইতে পারে তার জন্য ভাল করিয়া ঘিরিয়া রাখিতে হয়।

এই সব কাজই আমার ছোট ভাইবোনদের সাহায্য করিতে লাগিলাম।

তাহারা ত খাঁচা বানাইতে পারে না। গ্রামের লোকেরা আমাদের কাজ দেখিয়া খুশী হইয়া নিজেরাই খাঁচা বানাইয়া লইল।

আমাদের লাগান চারা গাছগুলো ধীরে ধীরে বড় হইতে লাগিল। সেই সঙ্গে আমার ভাইবোনেরাও বড় হইতে লাগিল। আমার যত ভাল লাগিত চারা গাছগুলোকে বড় হইতে দেখিয়া, তার চাইতেও ভাল লাগিত ভাইবোনগুলো আস্তে আস্তে বড় হইতেছে দেখিয়া।

এই সব কাজ করাতে গ্রামের লোকেরা আবার আমার আপন জন হইয়া উঠিল।

২৬ ☐ গয়মানীর শেষ কাহিনী

রূপাই মল্লিকের সাথে সেদিন পথে দেখা। সে বলিল, "কবি সাহেব! আপনি আমার বাড়ি যান না কেন? গয়মানী শ্বশুর বাড়ি হইতে আসিয়াছে। সে আপনাকে মাথার দিব্যি দিয়া যাইতে বলিয়াছে।"

এতটুকু বয়সে বিবাহ হইলে কি হইবে। বিয়ের পরেই গয়মানীকে পর্দা করিতে হইয়াছে। বাড়ির ত্রিসীমার বাইরে তার যাওয়ার উপায় নাই। নতুবা সে নিজেই দৌড়াইয়া আসিত আমাকে দেখিতে।

গয়মানী আমার সোনার গয়মানী-সেই হলুদের মত রাঙা টুকটুকে বোনটি আমার। ছোট কচি দুইখানা হাত দিয়া আমাকে জড়াইয়া ধরিত। তারপর

খইর মত তাহার মুখ হইতে কত আদরের কত কথা বাহির হইয়া আসিত। তাকে আদর করিয়া প্রান ভরিত না। তাকে কিছু উপহার দিতে পারিলে আমি হাতে স্বর্গ পাইতাম। আমার সেই গয়মানীকে আজ দেখিতে যাইব।

তার বাপ যে দিন আমাকে তাদের বাড়ি যাইতে নিষেধ করিল সে দিন সারারাত আমি ঘুমাইতে পারি নাই। দুই হাতে মাথার চুল ছিঁড়িতে লাগিলাম। মনে মনে ভাবিলাম গয়মানী যদি আমার আপন বোন বা মেয়ে হইত, তবে তো কেউ আমাকে তার সঙ্গে দেখা করিতে নিষেধ করিতে পারিত না।

আজ আমার গয়মানীকে দেখিতে যাইব। গয়মানীর যে বিবাহ হইয়াছে তিন বছর আগে। তা আমার একবারও মনে হইল না। মনে হইল কালই যেন গয়মানীর সঙ্গে আমার দেখা হওয়া বন্ধ হইয়াছে।

গয়মানীর জন্য কিছু বাতাসা আর চিনিসন্দেশ কিনিয়া লইলাম। চিনির সন্দেশ খাইতে গয়মানী বড়ই ভালবাসিত।

গয়মানীদের বাড়ি যাইয়া পৌঁছিলাম। করুণ হাসিয়া গয়মানী আমাকে সালাম করিল।

মুখের দিকে চাহিয়া আমার মনে হইল আমি যেন কাকে দেখিতেছি। সেই হলুদের মত গায়ের ডুগু ডুগু রঙে কে যেন কালি মাখাইয়া দিয়াছে। গয়মানীর চঞ্চল কালো চোখ দুইটি দেখিয়া বনহরিণীর চোখ মনে পড়িত। সেই চোখ এখন কোটরগত। হাত পা-গুলি যা দেখিয়া সোনালতার কথা মনে পড়িত তা এখন শুকাইয়া কাঠ হইয়া গিয়াছে। হাতে গায়ে কানে সোনার অলঙ্কার কিন্তু তার রোগজীর্ণ দেহকে যেন উপহাসই করিতেছে।

গয়মানীর পায়ে মুখে পানি নামিয়াছে। কিছুই খাইতে পারে না। পেটটা ফুলা।

গয়মানীর মা বলিল, "কবি সাহেব। শুভ খবর। গয়মানীর ছেলে হইবে।"

মায়ের কথা শুনিয়া গয়মানী যেন মাটির সঙ্গে মিশিয়া যাইতে চাহে।

হায় ! হায়! এই এতটুকু মেয়ের সন্তান হইবে? তার উপর এমন দুর্বল স্বাস্থ্য। গয়মানীর ভবিষ্যৎ যেন আমার চক্ষের সম্মুখে কে লিখিয়া রাখিয়াছে, সে লেখা এত স্পষ্ট যে বার বার অন্যমনস্ক হইয়াও কে যেন আমাকে দিয়া তাহা পড়াইয়া লইল। পড়িয়া আমার মাথায় যেন আসমান ভাঙিয়া পড়িল।

তার মা বলিল, "গয়মানী কোন দিনই তার কবি ভাইকে ভুলিবে না।"

আমি বলিলাম, "গয়মানী তোমার ছেলে ওয়াও ওয়াও করিয়া কাঁদিবে।" এই বলিয়া শিশুদের অনুকরণে ওয়াও-ওয়াও করিতে লাগিলাম।

গয়মানী হাসিয়া কুটি কুটি হইল।

কয়েকদিন পরেই গয়মানীর প্রসব বেদনা আরম্ভ হইল।

আমি আগেই শহরের লেডি ডাক্তারকে গয়মানীর কথা বলিয়া রাখিয়াছিলাম। তিনি বলিয়াছিলেন,- "প্রথম গর্ভবতীর প্রসব বেদনা প্রায় দশ বারো ঘন্টা থাকে। আপনি ব্যথা আরম্ভ হইলে তাকে হাসপাতালে লইয়া আসিবেন।"

রূপাই মল্লিককে বলিলাম, "দেখ, গয়মানীর শরীর খুব দুর্বল। সন্তান হওয়ার সময় ওর বিপদের খুব আশঙ্কা আছে। ওকে হাসপাতালে লইয়া যাই।"

রূপাই বলিল, "শামছুর মা দেশের মধ্যে নাম করা দাই। তার হাতে শত শত ছেলে মেয়ে হইয়াছে। তাকে খবর দিয়াছি। সে আসিল বলিয়া।"

আমি উত্তর করিলাম, "শামছুর মা কোন হাসপাতালের শিক্ষিত দাই না। তার হাত পা নোংরা অপরিষ্কার। তা ছাড়া গয়মানীর শরীর ভাল না। সন্তান জন্মিতে তার যদি কোন বিপদ ঘটে শামছুর মা কিছুই করিতে পারিবে না। হাসপাতালে বড়বড় ডাক্তার আছে। সেখানে বহু রকমের ডাক্তারী যন্ত্রপাতি আছে দরকার হইলে ডাক্তারেরা এই সব যন্ত্রপাতির সাহায্যে গয়মানীকে নিরাময় করিবে। তা ছাড়া সেখানে অক্সিজেন নামে এক রকম বাতাস আছে। গয়মানীর যদি নিশ্বাসের কষ্ট হয় সেখানকার ডাক্তার গয়মানীর নাকে তাহা প্রয়োগ করিয়া তার শ্বাসপ্রশ্বাসের কাজ সহজ করিয়া দিবে।"

গয়মানীর মা বলিল, "কবি সাহেব। আপনি আগেই অত অকথা-কু-কথা বলিতেছেন কেন? এতে গয়মানীর খারাপ হইবে। আপনি বাড়ি যান।"

ইতোমধ্যে শামছুর মা পান চিবাইতে চিবাইতে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার এক হাতে চুনের কৌটা অন্য হাতে দাঁত মাজিবার তামাক পোড়ার গুঁড়া।

গয়মানীর মা অতি আদরের সঙ্গে তাহাকে ডাকিয়া বলিল, "বুবু গো, এই কবি সাহেব বলেন, তুমি নাকি ভালমত দাই-এর কাজ জান না। তিনি গয়মানীকে হাসপাতালে লইয়া যাইতে বলেন।"

ঘরের বারান্দার কোণে একখাবলা পান দোক্তা মেশানো পিক ফেলিয়া শামছুর মা বলিল, "এই আমার হাতে হাজার হাজার পোয়াতি পার করিয়া

দিয়াছি। আর ডাক্তারের কথা বলিতেছেন? ডাক্তার যে রোগী ফেলিয়া যায়, এই শামছুর মা সেটা পার করে। কও ত বুবু সেই রহিমের মেয়ের কথাটা।"

রূপাইর বউ বলিল, "সে কথা গ্রামে জানে না এমন লোক নেই। তিনদিন রহিমের মেয়ের প্রসব বেদনা। জগাই ডাক্তার কত রকমের ঔষধ দিল কিছুই করিতে পারিল না। তখন এই শামছুর মা যাইয়া এক নিমেষে খালাস করিয়া দিল।"

বুঝিলাম এক কোয়াক ডাক্তারনী আর এক কোয়াক ডাক্তারকে পরাজিত করিয়াছে। উৎসাহ দিলে এরূপ গল্পের আর বিরাম হইবে না।

শামছুর মা আরও একটি পান মুখে দিয়া তার কীর্তি কাহিনী আরও কিছু বলিতে যাইতেছিল। কিন্তু ঘরের মধ্যে গয়মানীর অসহ্য ব্যথায় চিৎকার আঁচল দিয়া মাজা পেঁচাইয়া সে ঘরের মধ্যে যাইতেছিল। আমি তাহাকে বাধা দিয়া বলিলাম, "শামছুর মা, তোমার হাতের আঙ্গুলে বড় বড় চাড়া। সেগুলো কাটিয়া দুহাত ভালমত সাবান দিয়া ধুইয়া পরিস্কার করিয়া রোগিনীর কাছে যাও।"

আমার কথাগুলি যেন পাগলের প্রলাপ। শামছুর মা তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলিল, "বড় নতুন কথা শুনাইলেন কবি সাহেব। আমার হাত পরিষ্কার নয় এমন কথা কেবল আপনার মত লোকই বলিতে পারে। কি, আমার হাতে কি গু লাগিয়া আছে? না ময়লা লাগিয়া আছে? দেখ ত বুবু?"

রূপাইর বউ মাথা নাড়িয়া তার একথার সমর্থনে কি বলিতে যাইতেছিল। আমি তাহাকে বাধা দিয়া বলিলাম, "তোমার হাতের বড় বড় চাড়ার মধ্যে ময়লা লাগিয়া আছে। পান আর দোক্তার রঙ তোমার হাতে লাগিয়া আছে। এই হাতে রোগীনীকে প্রসব করাইলে তাহার ক্ষতি হইবে।"

আমার কথায় রাগিয়া মাগিয়া শামছুর মা বলিল, "কি এত বড় কথা। আমার হাতের চাড়ার মধ্যে ময়লা। এত কথা শুনিবার মেয়ে নয় এই শামছুর মা। ওই কবি সাবকে দিয়াই মেয়ের কাজ করাও। আমি চলিলাম গো বাবু।"

এই বলিয়া শামছুর মা চলিয়া যায় আর কি। গয়মানীর মা তার হাত দুখানা ধরিয়া বলিল, "ওই বাহিরের মানুষের কথা কানে নিও না বুবু। আমরা জানি না তোমার কত কেরামতি?' ওদিকে গয়মানী প্রসব বেদনায় চীৎকার করিতেছে। সেই ময়লা হাত পায়ে শামছুর মা আঁতুড় ঘরে ঢুকিল।

গয়মানী আমাকে বলিল, “কবি ভাই! কতদিন আপনাকে দেখি নাই। শ্বশুর বাড়ি যাইয়া আপনাকে দেখিবার জন্য সব সময় আমার মন আকুলি-বিকুলি করিত। কিন্তু কি করিব? অভাগা নারী জীবনে কোন ইচ্ছাই পূরণ করিবার ক্ষমতা আল্লাহ আমাকে দেয় নাই।”

আমি বলিলাম, “সোনা বোন! তোমার মতই আমারো মন তোমার জন্য আকুলি বিকলি করিত।”

আঁচলে চোখ মুছিয়া গয়মানী বলিল, “কবি ভাই! আমার সামনে যে বিপদ আসিতেছে তা হইতে বাঁচিব বলিয়া মনে হয় না। যে কয়দিন আছি আপনি আমাকে দেখিতে আসিবেন।”

মাথা নাড়িয়া তাহার কথায় সায় দিলাম।

এরপর রোজই গয়মানীকে দেখিতে যাইতাম। শ্বশুর বাড়ি তার উপর কত রকমের অত্যাচার হইত ধীরে ধীরে গয়মানী আমাকে তাহা সবিস্তারে বলিত।

সে তাঁতীর মেয়ে। তাদের সমাজের মেয়েরা এবাড়ি ওবাড়ি বেড়াইতে যায়। নদীতে যাইয়া সাঁতার কাটিয়া স্নান করে। রোজ সন্ধ্যা বেলায় কলসী কাঁখে লইয়া দলবদ্ধ হইয়া নদী হইতে পানি লইয়া আসে। নদীর ঘাটে বসিয়া কলস ঘুরাইতে ঘুরাইতে তাহাদের কত হাসি তামাসা। কত গালগল্প। কেউ সখির গায়ে পানি ছিটাইয়া দেয়। অপরে তাহার ভরা কলসীর পানি ফেলিয়া দেয়। কৃত্রিম ক্ষোভে সখিকে সাঁসাইয়া সে আবার কলসীতে পানি ভরে।

ডাঙ্গার দেশে গয়মানীর শ্বশুর বাড়ি। সেখানে নদী নাই। নদী থাকিলেও বাড়ির মেয়েদের নদীতে যাইবার হুকুম নাই। বাড়ির কয়খানা ঘরের মধ্যে সামান্য উঠান। তারি মধ্যে গয়মানীকে এত কাল কাটাইতে হইয়াছে। ’বাপের বাড়ির জঙ্গলে বছরে বছরে শেওড়া ফল পাকে ডুমকুর গাছে পাকা ডুমকুরে কালো হইয়া ওঠে। এ সবের জন্য গয়মানীর মন কাঁদিত। জ্যৈষ্ঠ মাসে বাড়ির পালানে কাঁধিতে কাঁধিতে খেজুর পাকে। সে যদি বাপের বাড়ি যাইতে পারিত আঁচল ভরা পাকা খেজুর টুকাইয়া তার কবি ভাইকে খাইতে ডাকিত।

এমনি কত কথা গয়মানীর মুখে। বহুদিন পরে আমাকে পাইয়া গয়মানীর মুখে কথার খই ফুটিয়াছে।

আমি গয়মানীর মাকে ডাকিয়া বলিয়া দিলাম, গয়মানীকে সব সময় যেন হাসি খুশীতে রাখা হয়। শষা, পেপে, কলা প্রভৃতি ফল যেন তাকে খাইতে দেয়া হয়।

আমি রোজ তাহাকে একটি করিয়া ডাব আনিয়া তাহার পানি খাওয়াইতাম। ডাবের পানি খাইলে গর্ভবতী মেয়েদের উপকার হয়। গয়মানী সন্ধ্যা বেলায় আরো মেয়েদের সহিত নদীতে পানি আনিতে যাইতে চাহিত।

আমি বলিলাম, "গর্ভবতী অবস্থায় তুমি যদি ভরা কলসী কাঁখে লইয়া নদী হইতে বাড়ি আস তোমার পেটের সন্তানের ক্ষতি হইবে। এই অবস্থায় তোমার পক্ষে কোন কঠিন কাজ করা উচিৎ হইবে না।"

গয়মানী জিজ্ঞাসা করিল, "তবে কি আমি সব সময় শুইয়া কাটাইব ?"

আমি বলিলাম, "না, তাহা করিলেও তোমার খারাপ হইবে। বাড়িতে সামান্য কাজ করিও। এখানে সেখানে নড়াচড়া করিও। আর সব সময় মন খুশী রাখিবে। কোন সময় মন খারাপ করিবে না।"

গয়মানীর মাকে বলিলাম, "রোজ গয়মানীর কিছু দুধ খাওয়ার দরকার। ওর পেটে যে সন্তান আছে সেও ওর খাবার হইতে কিছুটা খায়।"

গয়মানীর মা বলিল, "কবি সাহেব! আমরা গরীব মানুষ। গয়মানীর জন্য দুধ কিনিবার পয়সা পাইব কোথায়?"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "শুনিয়াছি গয়মানীর শ্বশুর বেশ বড় লোক। তোমার বিয়াইর কাছ হইতে দুধের টাকা আদায় কর না কেন?"

গয়মানীর মা বলিল, "সেই যে গয়মানীকে এখানে আনিয়াছি। তাহারা কি একবারও গয়মানীকে দেখিতে আসিল ? তাঁতীর ঘরে ছেলে বিয়ে করিয়াছে বলিয়া তার নাকি মান গিয়াছে।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "জামাই ত আসিতে পারে। সে আসে না কেন?"

গয়মানীর মা বলিল, "সে কথা কি আর বলিব আপনাকে! গয়মানীর চেহারা খারাপ হইয়া গিয়াছে। সে নাকি আর এক বিবাহ করিবে।"

গয়মানীর মুখখানি কালো হইয়া উঠিল। গয়মানীর সামনে আমার এসকল কথা আলোচনা করা উচিৎ হয় নাই।

গয়মানীর পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলাম, "কিরে গয়মানী। ছেলে কোলে পাইয়া তোর কবি ভাইকে ভুলিয়া যাবি না তো?"

গয়মানী লজ্জায় মাথা নত করিল।

বাহিরে দাঁড়াইয়া আমি কেবল রাগে দুঃখে ফুলিতে লাগিলাম।

হায় অজ্ঞানতা ? হায় অন্ধ বিশ্বাস, এরি ছুরির আঘাতে আজ আমার এত আদরের গয়মানী কোরবাণী হইবে। তার অজ্ঞান পিতা কুসংস্কার গ্রস্ত মাতা এই অসহায় মেয়েটিকে আজ বদ্ধভূমিতে বলিদান করিতে যাইতেছে। আমার কেবলই মনে হইতে লাগিল, এদের সবাইকে মারিয়া ওই বন্ধ ঘরের দরজা ভাঙিয়া গয়মানীকে কাঁধে করিয়া হাসপাতালে লইয়া যাই।

সারাদিন গয়মানী প্রসব বেদনায় চীৎকার করিতে লাগিল। তার চীৎকার আমার বুকখানা যেন ভাঙিয়া চুর্ণবিচুর্ণ হইতে লাগিল।

বাহির হইতে শুনিতে পাইতেছিলাম, গয়মানী বলিতেছে, “মা তোমার পায়ে পড়ি। আমার কবি ভাইকে একবার আমার কাছে আসিতে দাও।”

অল্প সময়ের জন্য আমাকে ঘরের ভিতর যাইতে দেওয়া হইল। ব্যথায় গয়মানী কথা বলিতে পারে না, তবু অতিকষ্টে বলিল, “কবি ভাই! আমি বুঝি বাঁচিব না। যদি মরিয়া যাই আমার কথা মনে রাখিবেন। আপনার কাছে অনেক স্নেহ মমতা পাইয়াছি। তার কোন পরিশোধ দিয়া যাইতে পারিলাম না। আপনি আমার মাথায় হাত খানি বুলাইয়া দিন।”

গয়মানীর মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলাম, “গয়মানী তুমি ভাল হইয়া উঠিবে। কোন ভয় করিও না।” বলিতে বলিতে আমার চোখ দুইটি অশ্রুসজল হইয়া উঠিল।

সন্ধ্যা বেলা গয়মানী মরা ছেলে প্রসব করিল। তারপর তার কি চীৎকার। সেই চীৎকারও ধীরে ধীরে নিরব হইয়া আসিল। গয়মানীর মৃতদেহের উপর পড়িয়া তার মা বাপ আকাশ পাতাল ফাটাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

গয়মানীর মৃত্যুর পর আমি আর গ্রামে থাকিতে পারিলাম না। যেখানে যাই সেখানেই গয়মানীর স্মৃতি চিহ্ন। ওই ডুমকুর গাছটির তলায় গয়মানী আঁচল ভরিয়া ডুমকুর তুলিত। ওই বারুই গাছটিতে গয়মানী আকসি দিয়া বোরুই পাড়িত। ওই পথ দিয়া বন্দরে যাইতে গয়মানী তার কচি হাত দুখানি দিয়া আমাকে জড়াইয়া ধরিত।

গ্রামের যেখানে যাই সেখানেই গয়মানীর চিহ্ন লাগিয়া আছে। তাই আজ এ গ্রাম ছাড়িয়া দূরের এক অজানা সফরে চলিলাম।

সেখানে বসিয়া মনে মনে চিন্তা করিব কি করিয়া গয়মানীর মত মেয়েদের অশিক্ষিত দাই ও কোয়াক ডাক্তারদের হাত হইতে রক্ষা করিতে পারিব।

কি করিয়া আসমানীর মত মেয়েটিকে দারুণ ভুখের জ্বালা হইতে রক্ষা করিতে পারিব। কি করিয়া ভন্ডপীরের হাত হইতে অগণিত জনসমাজকে রক্ষা করিতে পারিব।

গয়মানী, আসমানী এরা ত দুই জনই নয়। সারা দেশ ভরিয়া শত শত গয়মানী আর আসমানী এদের মত ফুলের কলি মেয়ে নিষ্ঠুর সমাজের হাতে আরও কত রকমের অত্যাচারে জীবন বিসর্জন দিতেছে। সেই ভন্ডপীরও একা নয়। সারা দেশে কতরূপে কৌশলজাল বিস্তার করিয়া তাহারা অজ্ঞান জনসমাজকে ঠকাইয়া বেড়াইতেছে। ইহাদের হাত হইতে আমার আদরের দেশবাসীকে কি করিয়া রক্ষা করা যায় নির্জন সাধনায় বসিয়া আমি সেই কথা চিন্তা করিব।

বিদায়ের সময় আমার ছোট ছোট ভাইবোনেরা কাঁদিবে। বিশেষ করিয়া আসমানীকে কিছুতেই প্রবোধ দেওয়া যাইবে না।

তাই গভীর রাত্রে গোপনে আমি চলিয়া যাইতেছি। যাইবার আগে দেশে, বিদেশে, জানা, অজানা সকল ভাই বোনদের কাছে আমার শেষ পত্রখানা লিখিয়া রাখিয়া যাইতেছি।

২৭ ❑ কবি ভাই'র শেষ পত্র

আমার সোনামনি ভাই বোনেরা, তোমাদের কাছে হয়ত আমার এই শেষ চিঠি। এখন আমি বৃদ্ধ হইয়াছি। আর কত দিন বাঁচিয়া থাকিব জানি না। যদি স্বাস্থ্য ভাল থাকে আর বাঁচিয়া থাকি আবার আমি তোমাদের কাছে চিঠি লিখিব। চিঠির ঘুড়ি উড়াইয়া তোমাদের ঘরে ঘরে যাইব।

আমাদের এই সোনার বাংলাদেশ। দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের তীরে চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, নীলা, টেকনাফ। ওধারে খুলনার ওপারে পৃথিবীর অপূর্ব প্রাকৃতিক সম্পদ সুন্দরবন।

পূর্বে ব্রহ্ম দেশ, উত্তর পশ্চিম বঙ্গের আর এক অংশ। এ দেশের সকল অধিবাসী বাংলায় কথা বলে। পৃথিবীতে এমন মিষ্টি ভাষা আর কোন দেশে নাই। কোন সুদূর অতীত কাল হইতে এদেশে দ্রাবিড়, আর্য্য, অনার্য্য শক, হুন, মোঘল, পাঠান প্রভৃতি কত জাতি আসিয়াছে। এমন মধুর বাংলা ভাষার মোহে তাহারা সকলেই বাঙালীর ভাষা গ্রহণ করিয়াছে। তাহারা সকলেই বাঙালী হইয়া গিয়াছে।

এ দেশে পদ্মা, মেঘনা, যমুনা শীতলক্ষ্যা, ধলেশ্বরী, কুমার, গড়াই, কর্ণফুলী কত শত শত নদী। নদীগুলোর নাম শুনিলেই প্রাণ জুড়াইয়া যায়। এই সব নদী পথ দিয়া দেশের পণ্য সম্ভার বিদেশে যাইয়া সেখান হইতে কতকিছু লইয়া আসে।

এদেশ তোমার-এদেশ আমার-এ দেশ সকল বাঙালীর। তেলী, তাঁতী, কামার, কুমার, চাষী, মজুর, কাঁশারী, শাঁখারী এরা বংশানুক্রমে নিজ নিজ শিল্পের সাধনা করিয়া প্রতি পদে পদে দেশের গৌরব বাড়াইতেছে। ইহাদের সকলের কথা আজ বিস্তৃত করিয়া তোমাদের বলিতে পারিলাম না।

দেশের শাসনভার যাহাদের হাতে, তারা এদের ভালবাসে না। এদের কাজের উপযুক্ত মূল্য দেয় না। তোমরা বড় হইয়া এদের পাশে যাইয়া দাঁড়াইও।

তোমরা বহুকাল বাঁচিয়া থাকিবে। দেশের মানুষকে জানিবার বহু সুযোগ তোমরা পাইবে। তাহাদিগকে জানিয়া তাহাদের অভাব অভিযোগের প্রতিকার করিও। আমার সীমিত জীবনে তোমাদের কাছে শুধু বাংলাদেশের জনগণের কথাই বলিয়াছি। কবিতায় কাহিনীতে নাটকে তাহাদের কথা কেবলই বলিয়া গিয়াছি। তবু আমি সব বলিয়া শেষ করিতে পারি নাই।

এদেশের আরো অনেক সৌন্দর্য আছে। আরও অনেক গুণপণার কাহিনী আছে। আরও অনেক অমূল্য সম্পদ লোক চক্ষুর অন্তরালে লুকাইয়া আছে। যুগ-যুগান্ত চলিয়া গিয়াছে। সে সবের কেহই সন্ধান পায় নাই।

তোমাদের উপর আমার ভার রহিল, তোমরা সে সব খুঁজিয়া বাহির করিও। বাহির করিয়া সে সবের উপযুক্ত সমাদর করিও। দেশ দেশান্তে ঘুরিয়া তাহার প্রচার করিও।

আমার দেশকে আমি দুই রূপে দেখিয়াছি। নদ-নদীর পানিতে ধোয়া নানা শস্যের নানা রঙের নক্‌শা আঁকা আমার দেশের এক রূপ।

আর শহরে, বন্দরে, নগরে, বাজারে, কুটিরে পল্লীতে ঘাটে মাঠে, তটে নানা কাজে নানা সাধনায় ব্যস্ত আছে দেশের অগণিত মানুষ। এদের রূপ আমি দেখিতে পাই এদেশের সাহিত্যে এদেশের গানে। সুদূর নদী পথে নৌকা ভাসাইয়া এদেশের মাঝিয়াল সুললিত ভাটিয়ালী সুরে এদেশের প্রাণের কথা মনের কথা গাঁথিয়া বেড়াইতেছে।

ঘন পাটবনে, প্রখর রৌদ্রে ধানের গোড়া নিড়াইতে এদেশের চাষীরা অপরূপ লোক সঙ্গীত রচনা করিয়াছে তাহারই মধ্যে খুঁজিয়া পাই এদেশের অগণিত মানুষের মনের রূপ।

যেমন পাহাড়ে পর্বতে নদীতে সাগরে বনে প্রান্তরে দেশের এক রূপ। তেমনি কামার-কুমার, তাঁতী, ছুতার-কৃষক-মজুর, কাঁশারী, ঠাটারী, শাঁখারী, পশারী, ছাত্র, পন্ডিত সকল মানুষ মিলিয়া দেশের আর এক রূপ। দুই-এ মিলিয়া দেশের এই দুই যুগল প্রতীক।

জারি, সারি, মুর্শীদা, গাজী কত গানে, কত কেচ্ছায়, কত ছড়ায় দেশের এই দুই রূপের প্রকাশ পাইতেছে।

এই দেশের সকল কথা আমার মনের মত করিয়া তোমাদের কাছে বলিয়া যাইতে পারিলাম না।

অবসর মত তোমরা দেশে বনে প্রান্তরে পল্লীতে ঘুরিয়া বেড়াইও। সেখানে যে অপরূপ রূপ দেখিতে পাইবে তাহাই তোমাদিগকে এদেশকে ভালবাসিতে শিখাইবে।

আজকের মত আমার সোনামণি ভাইবোনেরা বিদায়। আমি যখনই যেখানে থাকি মনে রাখিও, আমার শুভ কামনা সব সময় তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিতেছে।

ইতি
তোমাদের
কবি ভাই

সমাপ্ত।

Scanned by roni060007